গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ১ - ৭ এপ্রিল ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পেটেন্ট বিল পাশ

সিপিএমের প্রতারণামূলক ভূমিকার তীব্র নিন্দায় কমরেড নীহার মুখার্জী

কালা 'পেটেন্ট (সংশোধনী) বিল'-এর খসড়ায়, তাদের কথা মতো, ওপর ওপর লোকদেখানো কিছু পরিবর্তনকে 'বিরাট জয়' হিসাবে দেখিয়ে সিপিএম, সিপিআই পার্লামেন্টে যেভাবে বিলটিকে নিরাপদে পাশ হতে দিল, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী তার তীব্র নিন্দা করেছেন। ২৬ মার্চ ২০০৫ এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, তাদের এই প্রতারণাপূর্ণ ভূমিকার মধ্য দিয়ে ডব্লিউ টি ও'র মাধ্যমে ক্রিয়াশীল বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের হুকুমদারির কাছে জনস্বার্থকে নির্লজ্জভাবে বিসর্জন দেওয়া হল। এই ঘটনা আবারও নগ্নভাবে দেখাল, ক্ষমতাসীন পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় পরিচালিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতির প্রশ্নে মেকি মার্কসবাদীদের বিরোধিতা কত ভুয়ো।

কমরেড নীহার মুখার্জী জনগণের প্রতি কংগ্রেস ও তার মেকি মার্কসবাদী সহযোগীদের চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হতে এবং দেশব্যাপী গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারের ভয়াবহ আর্থিক নীতিগুলি প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভ্যাট

লক্ষ্য বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষা ঃ পরিণাম মূল্যবৃদ্ধি

১ এপ্রিল ২০০৫ থেকে দেশের সমস্ত রাজ্যে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স, অর্থাৎ 'ভ্যাট' চালু করতে কেন্দ্রীয় সরকার বদ্ধপরিকর। ভ্যাট চালু করার ব্যাপারে গররাজি রাজ্যগুলিকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ডান হাত হিসাবে কাজ করেছে পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার। রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী জোর গলায় বলেছেন, তাঁরা ভ্যাট চালু করবেন। সংবাদে প্রকাশ, ভ্যাট চালু হচ্ছে ধরে নিয়েই রাজ্য বাজেটে কর বাবদ সরকারি আয়ের হিসাব করা হয়েছে। এদিকে রাজ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ভ্যাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ফেডারেশন অব ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েসন্সের নেতা মহেশ সিংহানিয়া প্রয়োজনে লাগাতার ব্যবসা বন্ধ করার কথা বলেছেন। ফেডারেশন অব ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন-এর সম্পাদক তারক নাথ ত্রিবেদীও ভ্যাটের বিরোধিতা করেছেন। ইতিমধ্যেই বিজেপি শাসিত চারটি রাজ্য সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য ভ্যাট চালু করবে না বলে জানিয়েছে। কংগ্রেসের দেখানো পথে বি জে পি পরিচালিত এন ডি এ সরকার যখন ভ্যাট চালু করার প্রস্তাব এনেছিল, তখন বেশিরভাগ রাজ্য সরকার তা মানতে চায়নি।

১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক ডেকে, সেখানে ভ্যাট নিয়ে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার। তাদের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালের ১৬ নভেম্বর বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে এ ব্যাপারে একটি ভারপ্রাপ্ত কমিটি গঠন করা হয়, যার আহ্বায়ক নিযুক্ত হন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এই কমিটিই আলাপ-আলোচনা করে ভ্যাট সম্পর্কে অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের যা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তা দূর করে ভ্যাট চালু করতে রাজি করিয়েছে।

রাজ্যগুলির আশঙ্কা ছিল, ভ্যাট চালু হলে রাজ্যের আয় কমতে পারে। কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, যদি রাজ্যের আয় কমে, তবে প্রথম বছর পুরো, দ্বিতীয় বছর ৭৫ শতাংশ ও তৃতীয় বছর ৫০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ কেন্দ্র দেবে। চতুর্থ বছর কী হবে তা আর বলা হয়নি। অসীমবাবু কিন্তু জোর দিয়ে বলেছেন — রাজ্যের আয় কমবে না।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি থেকে কী বেরিয়ে আসে? বেরিয়ে আসে এই যে, একদিকে কেন্দ্রীয়

চারের পাতায় দেখুন

রাজ্য কমিটির বিবৃতি

ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনের সমর্থনে এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

"বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষজ্ঞ এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির সাথে কোন আলোচনা না করেই একতরফাভাবে ১ এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভ্যাট চালু করার সিদ্ধান্তের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

"আমরা মনে করি, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় পুঁজিবাদের স্বার্থে সংস্কারের নামে ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের যে অর্থনীতি চালু করা হয়েছে ভ্যাট তারই ফলশ্রুতি। উৎপাদক বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির ট্যাক্সের ভার লাঘব করে

চারের পাতায় দেখুন

হাজার হাজার বিদ্যুৎগ্রাহকের পার্লামেন্ট অভিযান

(সংবাদ ৮-এর পাতায়)

মালিকশ্রেণী খুশি

রাজ্য সরকারের গরিব দরদী (!) বাজেট

আগামী মে-জুন মাসে কলকাতা সহ রাজ্যের ৮১টি পুরসভার ভোট এবং আগামী বছর বিধানসভা ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে ২১ মার্চ অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ২০০৫-০৬ সালের বাজেট ভাষণে সকলকে খুশি করতে দু'হাতে প্রতিশ্রুতি বিলিয়েছেন। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে আর পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের সুযোগ মিলবে না ধরে নিয়ে অর্থমন্ত্রী সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের শিক্ষক, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী, বেকার যুবক-যুবতী, গ্রাম ও শহরের গরিব মানুষ সকলকেই নানা আর্থিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরমের পথে তিনি হেঁটেছেন। কারণ, তাঁরা জানেন, প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে এবং জনসাধারণ এসব মনে রাখেনা এবং হিসাবের কচকচির মধ্যে তারা ঢুকতেও চায়না। ফলে জনসাধারণকে ফাঁকি দিতে বিশেষ অসুবিধা হয়না।

যথারীতি রাজ্য বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন চেম্বারস্ অফ কমার্স মোটের ওপর খুশি। তারা বাজেটকে উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাগত জানিয়েছে। 'ভ্যাট' চালু করা নিয়ে নীতিগত ও মূলত কোন আপত্তি না থাকলেও, সব রাজ্যে একসঙ্গে ভ্যাট চালু না হওয়ার কারণে তাদের কিছু বক্তব্য রয়েছে। সবকটি রাজ্য এই মুহূর্তে ভ্যাট চালু করতে রাজি না হওয়াটাই তাঁদের আপত্তির মূল কারণ বলে জানান ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন্সের মহেশ সিংহানিয়া। কারণ, আন্তঃরাজ্য ব্যবসায় তাদের অসুবিধা হবে।

বাজেটের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, আগামী বছর সরকারের প্রস্তাবিত রাজস্ব ঘাটতি ৭,০২৩ কোটি টাকা। ২০০৪-০৫ সালে এই অর্থমন্ত্রী ৭,৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি প্রস্তাব করেছিলেন, সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী তা দাঁড়িয়েছে ৮,৯৫৮ কোটি টাকায়। গত বছর রাজস্ব সহ সমগ্র রাজকোষের প্রস্তাবিত ঘাটতি ছিল ১০,২৫০ কোটি টাকা; কিন্তু তা সংশোধিত হিসাবে দাঁড়িয়েছিল ১১,৮৭৫ কোটি টাকা। ফলে আগামী বছর রাজকোষ ঘাটতি যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এঙ্গেল ইন্ডিয়া ও ওয়েস্টবেঙ্গল কেমিক্যালস

জলের দরে বেচে দিল রাজ্য সরকার

রাজ্য সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত সংস্থা এঙ্গেল ইন্ডিয়া মেশিনস অ্যান্ড টুলস লিমিটেড এবং ওয়েস্টবেঙ্গল কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামক দুটি সংস্থাকে জলের দামে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার যে অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল, ২২ মার্চ তাকেই বিরোধীশূন্য বিধানসভায় পাশ করিয়ে নিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি ও ২২ ফেব্রুয়ারি দুটি পৃথক বেসরকারি শিল্পগোষ্ঠীর সাথে চুক্তির মধ্য দিয়ে সংস্থা দুটির বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে বামফ্রন্ট সরকার। এতদিন পর্যন্ত আইন ছিল, রাজ্য সরকারি কোন সংস্থার সম্পদ কেবলমাত্র সরকারি কোম্পানিতেই হস্তান্তর করা যাবে। বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে এই আইনি বাধা দূর করতেই বিধানসভাকে এড়িয়ে রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল। এই সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণের জন্য রাজ্য সরকার ব্রিটিশ সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দফতর (ডি এফ আই ডি)-র কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে ; তার শর্ত অনুসারেই এঙ্গেল ইন্ডিয়ার শ'দেড়েক কর্মীর মধ্যে মাত্র ২০ জনকে রেখে এবং ওয়েস্টবেঙ্গল কেমিক্যালসের ১০২ জন কর্মীর মধ্যে ৫০ জনকে রেখে বাকি সব কর্মীকে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে আগাম অবসরের কথা রাজ্য সরকার ঘোষণা করে।

এই বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে

ছয়ের পাতায় দেখুন

চটকল শ্রমিকদের বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতিতে সভা

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে চটশিল্পে মালিকী আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক সভা, শ্রমিক কনভেনশন শুরু হয়েছে। গত ২০ মার্চ জগদ্দল মোতিভবনে দেড়শতাধিক চটকল শ্রমিকের উপস্থিতিতে এমনই একটি শ্রমিকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রমিকরা মালিকী অত্যাচার এবং আক্রমণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এ্যালায়েন্স জুটমিল সহ বিভিন্ন মিলে 'উৎপাদন ভিত্তিক বেতন' চালু করার নামে বেতন কাটার ষড়যন্ত্র চলছে। অনেক সময় কাঁচামালের গুণমান নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, মেশিনারির অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না-করতে পারলে তাদের জোর করে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া গ্র্যাচুইটি না দিয়েই শ্রমিকদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথবা অর্ধেক বেতনে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ৫৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই শ্রমিকদের অবসর দেওয়া হচ্ছে। পার্মানেন্ট শ্রমিকদের পরিবর্তে মাত্র ৪০-৫০ টাকার দৈনিক বেতনে কন্ট্রাক্ট, ভাউচার ইত্যাদি শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। শ্রমিকদের গত পাঁচ বছর যাবত বোনাস থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে; পি এফ-এর টাকাও আত্মসাৎ করা হচ্ছে। এন ডি এ সরকারের পরিবর্তে সিপিএম সমর্থিত ইউ পি এ সরকার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হলেও বোনাস আইনের সংশোধনের মাধ্যমে ৩,৫০০ টাকার সিলিংকে পরিবর্তন করে ৭,৫০০ টাকা করার ন্যায্য দাবিকে মানা হচ্ছে না। শ্রমিকদের বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়া হচ্ছে না। এই ধরনের নানা জুলুম এবং অত্যাচারের কথা শ্রমিকরা তুলে ধরেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শ্রমিকনেতা কমরেড কমল ভট্টাচার্য। সভায় বক্তব্য রাখেন বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহ সম্পাদক কমরেড অমল সেন। এছাড়া কমরেডস মুর্তজা আলম, রামাশঙ্কর সিং, বদরুদ্দিন প্রমুখও বক্তব্য রাখেন। মূল বক্তব্যে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন যে, এইসব অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া শ্রমিকদের সামনে অন্য কোনও পথ নেই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, গত ২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত তিনটি শ্রমিক বিরোধী ত্রি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সিটু, আই এন টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সি নেতৃত্ব শ্রমিকদের মূল দাবিগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে মালিকদের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মালিকদেরই দাবি মেনে নেয় এবং ঐক্যবদ্ধ সংযুক্ত আন্দোলন ভেঙে দেয়। এরপর থেকেই মালিকী জুলুম আরও তীব্র হচ্ছে। আশার কথা, শ্রমিকরা সংগঠিত লড়াইয়ের জন্য ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পতাকাতলে সমবেত হচ্ছেন। সম্প্রতি ওয়েলিংটন জুটমিলে শ্রমিকরা আপসকামী প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন নেতৃত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ম্যানেজমেন্ট-দালালচক্রকে পরাস্ত করে পি এফ ট্রাস্টিবোর্ডের নির্বাচনে বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেন। অন্যান্য জুটমিলের শ্রমিকরাও এই সংগ্রামী ইউনিয়নের সাথে সংগ্রামী আদর্শের টানে যুক্ত হচ্ছেন। বরানগর, কামারহাটি, নৈহাটি জুটমিলেও শ্রমিক-দের নিয়ে সভা হয়। এই সমস্ত সভায়ও বক্তব্য রাখেন কমরেডস দিলীপ ভট্টাচার্য, অমল সেন, কমল ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। নৈহাটি জুটমিলে ব্যাপকহারে কন্ট্রাক্ট প্রথা চালু করা এবং অন্যান্য জুলুমের বিরুদ্ধে ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন জয়যুক্ত হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গোচরণ স্টেশন যাত্রীকমিটির আন্দোলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেললাইনে গোচরণ স্টেশনে দুটি টিকিট কাউন্টার খোলা, ১নং প্ল্যাটফর্মে আপ ট্রেনগুলি দাঁড় করানো, স্টেশনের বাথরুম, পায়খানা, প্রস্রাবাগার পরিচ্ছন্ন রাখা, স্টেশন সংলগ্ন রাস্তা নির্মাণের দাবিতে গোচরণ স্টেশন যাত্রীকমিটির পক্ষ থেকে কয়েকদিন ধরে প্রচার ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। ১০ মার্চ বিকাল ৪টায় শিয়ালদহ ডিআরএম-এর উদ্দেশে গোচরণ স্টেশন মাস্টারের কাছে গণস্বাক্ষর সহ দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন শঙ্কর প্রসাদ সাহা, সহদেব নস্কর, জয়দেব নস্কর, তাপস হাজরা, শঙ্কর বিশ্বাস প্রমুখ। স্টেশন মাস্টার ডিআরএম-এর সঙ্গে আলোচনা করে দাবিগুলি পূরণের চেষ্টা করবেন বলে জানান। যাত্রীকমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, দাবিগুলি পূরণ না হলে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে।

পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ

জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর গ্রামপঞ্চায়েতে ১৫ মার্চ এস ইউ সি আই উত্তর দুর্গাপুর কমিটির নেতৃত্বে ছয় শতাধিক নারীপুরুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সকল গরিব মানুষের নাম বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, রেশন কার্ড দেওয়া, নয়া পঞ্চায়েত কর নীতি ও খাজনা নীতি বাতিল করা প্রভৃতি দাবি নিয়ে এক প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত অফিসে এবং আর আই অফিসে ডেপুটেশন দেন। পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ বিশ্বজিৎ দাস, আয়নালি মোল্লা, সুমন্ত গাঙ্গুলী, আব্দুল কাদের গাজী প্রমুখ।

নদীয়া

পঞ্চায়েতগুলিতে কে কে এম এস-এর বিক্ষোভ ডেপুটেশন

খেতমজুরদের দৈনিক কাজ ও উপযুক্ত মজুরি, ফসলের ন্যায্য দাম ও বিপিএল তালিকায় সমস্ত গরিব মানুষের নাম নথিভুক্ত করার দাবিতে এবং জমির বর্ধিত খাজনা, নয়া পঞ্চায়েত কর, কালা সালিশী বিল, মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদ সহ আঞ্চলিক কিছু দাবিতে কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে গ্রামপঞ্চায়েত অফিসগুলিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

গত ৯ মার্চ নারায়ণপুর গ্রামপঞ্চায়েতে প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপপ্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেন কে কে এম এস-এর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জামসেদ সেখের নেতৃত্বে কমরেডস্ মোতালেব সর্দার, নেয়ামত সেখ, মফিজুল সর্দার।

ডেপুটেশনের আগে এক দৃপ্ত মিছিল এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখায়। এই জমায়েতে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড শেরফুল ইসলাম।

১৫ মার্চ ধোড়াদহ ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজ্যগত দাবি সহ এলাকার পানচাষীদের সমস্যা, অনাহারে মৃত্যু, এলাকায় ব্লু-ফিল্ম প্রদর্শনের প্রতিবাদে কমরেডস্ রেজাউল মোল্লা, নজরুল ইসলাম, আব্দুস সালাম, দুঃখী মহলদার, পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেন।

ডেপুটেশনের আগে ধোড়াদহ হাটে পথসভায় বক্তব্য রাখেন কে কে এম এস-এর জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ আব্বাস আলি ও শুকুর আলি মণ্ডল।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি মীরা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের আগে তিনশতাধিক নারীপুরুষের মিছিল পলাশি বাজার পরিক্রমা করে।

পূর্ব মেদিনীপুর

পঞ্চায়েত কর চালুর কালা সিদ্ধান্ত পাশ

সিপিএমের পাশে কংগ্রেস-তৃণমূল

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সিপিএম পরিচালিত তমলুক মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতি গত ১৮ মার্চ অভিকর, উপশুল্ক ও ফি আদায় সম্পর্কিত উপবিধি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করে নেয়। এই কর চালুর তীব্র প্রতিবাদ করে ওয়াকআউট করেন পঞ্চায়েত সমিতির এস ইউ সি আই প্রতিনিধিরা। কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিরা নীরব থেকে এই কর চালুর প্রস্তাব পাশ করতে সিপিএমকে সাহায্য করেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে চালু হবে পথ কর, সেতু কর। এছাড়া ছোটবড় মাছ ও মাংসের দোকানে, মুদি, চাল, মুড়ি টেপ-টিভি, ঘড়ি, পোষাকের দোকানে, ছোট কারখানা, মেলা, তীর্থস্থানেও এই নতুন পঞ্চায়েত কর চালু হবে। ফেরিওয়ালা, ব্যাপারিরাও এই কর থেকে রেহাই পাবেন না।

এই পঞ্চায়েত সমিতির এস ইউ সি আই সদস্য কমরেড বাসুদেব ধাড়া বলেন, সিপিএম পরিচালিত এই পঞ্চায়েত সমিতিতে ইতিপূর্বে কোন সাধারণ সভা আজকের মত ঠিক সময় শুরু করে অতিদ্রুত ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়ে সভা ভেঙে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আজকের সভায় তাই করা হল। এমনকী ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে করের আওতার বাইরে যে যে বিষয় ছিল, এই পঞ্চায়েত সমিতি ১৮ মার্চের সভায় সেইসব বিষয়ের উপরও অভিকর, উপশুল্ক ও ফি আদায়ের নানা রকম ব্যবস্থা নিয়েছে। যেমন, অন্যান্য কর যা চাপানো আছে তার বাইরে পঞ্চায়েত সমিতি মাছের দোকানে বার্ষিক কর চাপাবে ৩০০ টাকা, মাংসের দোকানে ১০০ টাকা, বড় মুদি দোকানে ২৫ টাকা, ছোট মুদির দোকানে ১০ টাকা, মুড়ি ব্যবসায়ীর ওপর ১০০ টাকা, গরুমহিষের খাটালে ১০০ টাকা, বড় মিষ্টির দোকানে ২০০ টাকা, কাঠের আসবাবের দোকানে ২০০ টাকা, এছাড়া আরও বহুবিধ বিষয়ে কর চাপানো হবে। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে তমলুক, পাঁশকুড়ার পৌরএলাকা সহ চণ্ডীপুর, ময়না, তমলুকের ৮২৬টি মৌজাকে যুক্ত করে হলদিয়া-তমলুক উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের যে সিদ্ধান্ত সরকারি দল করেছে তাও পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঐদিন এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে এই জনস্বার্থবিরোধী পঞ্চায়েত কর চালুর প্রতিবাদে মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এই বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলাকমিটির সদস্য ও নোনাকুড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেডস্ তপন ভৌমিক, মন্মথ দাস, ডাঃ সন্তোষ মাইতি, দিলীপ মাইতি, সন্তোষ সী ও বাসুদেব ধাড়া প্রমুখ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে নাগরিক কনভেনশন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসত স্টেশন থেকে করাবেগ হাট পর্যন্ত পি ডব্লিউ ডি রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে আছে। এই রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে গত ২২ মার্চ করাবেগ হাটে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন নদুরাম মণ্ডল। কনভেনশনে বিভিন্ন বক্তা এলাকার এই ধরনের সমস্যা সমাধানে আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বক্তব্য রাখেন সফি পৈলান, অমূল্যচরণ সাঁফুই, উদয় নস্কর, ধনঞ্জয় সরদার, হান্নান লস্কর প্রমুখ। রাজাপুর-করাবেগ, চালতাবেড়িয়া ও বামনগাছি থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন থেকে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে অরবিন্দ নস্কর ও আজিমুদ্দিন সেখকে যুগ্ম সম্পাদক এবং কালিপদ মণ্ডলকে সভাপতি করে ১৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

ভারত-নেপাল সীমান্তে বিক্ষোভ

নেপালে রাজা জ্ঞানেন্দ্র কর্তৃক জরুরি অবস্থা জারি করে নেপালের জনগণের সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের প্রতিবাদ জানিয়েছে এস ইউ সি আই। গত ১৯ মার্চ দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে ভারত-নেপাল সীমান্ত পানিট্যাঙ্কিতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ সংঘটিত হয় এবং নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র'র কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য এবং কমরেডস্ সঞ্জয় বিশ্বাস, জ্যোতি রাই প্রমুখ। ভারতের ও নেপালের শোষিত সংগ্রামী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা। উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে বহু সাধারণ মানুষ সামিল হন।

মার্ক্সবাদ ও উদারনীতিবাদ

কমরেড স্ট্যালিনের সাক্ষাৎকার

[১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই মহান নেতা স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ জি ওয়েলস্ বহু বিষয়ে আলোচনা করেন। ওয়েলস্ তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সমাজ-কল্যাণমূলক কিছু কর্মকাণ্ডের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দুনিয়াজোড়া আধিপত্য ছিল প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তখন উদীয়মান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আগ্রাসী চেহারা তখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হয়নি। সেই পটভূমিতেই এই সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয়েছিল — সম্পাদক, গণদাবী]

ওয়েলস্ ঃ মিঃ স্ট্যালিন, আমার সাথে কথা বলতে আপনি সম্মত হওয়ায় আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, আমি তাঁর মুখ্য ধ্যানধারণাগুলো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন আপনার কাছে জানতে এসেছি, আপনারা দুনিয়াকে বদলাবার জন্য কী করছেন...

স্ট্যালিন ঃ খুব বেশি কিছু নয়...

ওয়েলস্ ঃ আমি একজন সাধারণ মানুষের মতই দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াই এবং চারপাশে যা ঘটছে, একজন সাধারণ মানুষের চোখ দিয়েই তা প্রত্যক্ষ করি।

স্ট্যালিন ঃ জনসাধারণের ভালমন্দ নিয়ে চিন্তাশীল আপনাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষ নন। তবে ইতিহাসই একমাত্র বলে দিতে পারে, এ ধরনের ব্যক্তিরা কে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন। যাই হোক, আপনি দুনিয়াকে সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে বিচার করেন না।

ওয়েলস্ ঃ আমি বিনয়ের ভান করছি না। আমি বলতে চেয়েছি যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি দিয়েই আমি বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করি, একজন দলীয় রাজনীতিক বা দায়িত্বশীল প্রশাসকের দৃষ্টিতে নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ আমার মনে প্রবল আগ্রহ জাগিয়েছে। পুরানো গোটা আর্থিক ব্যবস্থাটা ধ্বসে পড়ছে; দেশের আর্থিক জীবন নতুন ধারায় পুনর্গঠিত হচ্ছে। লেনিন বলেছিলেন ঃ 'আমাদের ব্যবসা করা শিখতে হবে', তা শিখতে হবে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে। আজ, সমাজতন্ত্রের উদ্যমকে আয়ত্ত করতে হলে, পুঁজিপতিদের শিখতে হবে আপনাদের কাছ থেকে। আমার মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন একটা আমূল পুনর্গঠন চলছে, পরিকল্পিত অর্থনীতি অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তৈরি করা হচ্ছে। আপনি ও রুজভেল্ট দুটি ভিন্ন সূচনা-বিন্দু (starting points) থেকে কাজ শুরু করেছেন, কিন্তু তাই বলে কি ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে চিন্তাগত সম্পর্ক, চিন্তাগত আত্মীয়তা নেই? ওয়াশিংটনে আমি যা দেখে চমৎকৃত হয়েছি, এখানেও দেখছি সেই একই কাজ হচ্ছে। ওরা নতুন নতুন অফিসবাড়ি করছে, বহু রকমের নতুন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপকারী সংস্থা গড়ে তুলছে, অসামরিক প্রশাসন চালাবার জন্য আমলাতন্ত্র, যেটার প্রয়োজন বহুকাল ধরেই অনুভব করা যাচ্ছিল, ওরা সেটাও সংগঠিত করছে। আপনাদের মত পরিচালন দক্ষতা ওদেরও প্রয়োজন।

স্ট্যালিন ঃ আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নে যে লক্ষ্য নিয়ে চলছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা থেকে ভিন্ন লক্ষ্য অনুসরণ করছে। আমেরিকানরা যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, সেটা তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আমেরিকানরা সঙ্কট থেকে অব্যাহতি চাইছে ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক পুঁজিবাদী কার্যক্রমের ভিত্তিতেই, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভিত্তির বদল না ঘটিয়েই। বিদ্যমান ঐ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই যে ধ্বংস ও ক্ষতি দেখা দিয়েছে, সেটাকে কত কম করা যায়, ওরা সেই চেষ্টাই করছে। অন্যদিকে আমাদের এখানে, আপনি জানেন, অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থানে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, একটি নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছে। আমেরিকানরা যদি এমনকী, আপনার কথা অনুযায়ী, তাদের লক্ষ্যের আংশিক সাফল্যও পায়, অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতিকে ন্যূনতম স্তরে কমিয়ে আনতেও পারে, তবু নৈরাজ্যের যে শিকড়টা বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই রয়েছে, তাকে তারা ধ্বংস করবে না। তারা সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই বহাল রাখছে যেটা উৎপাদনে অনিবার্যভাবে নৈরাজ্য ডেকে আনে, নৈরাজ্য সৃষ্টি ছাড়া যার কোন পথ নেই। সুতরাং, তারা যা করছে সেটা সমাজ পুনর্গঠনের ব্যাপার নয়, নৈরাজ্য ও সংকট সৃষ্টিকারী পুরানো সামাজিক ব্যবস্থার বিলোপসাধনও নয়; একে বড়জোর বলা যায়, ক্ষয়ক্ষতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার, বাড়াবাড়িকে কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা। এই আমেরিকানরা সম্ভবত মনে মনে ভাবছে, তারা সমাজের পুনর্গঠন করছে; কিন্তু বাস্তবে তারা সমাজের বর্তমান ভিত্তিকেই বহাল রাখছে। সেজন্যই কার্যক্ষেত্রে সমাজের কোনরকম পুনর্গঠন এর দ্বারা ঘটবে না, পরিকল্পিত অর্থনীতিও ওখানে হবে না।

পরিকল্পিত অর্থনীতির মানে কী? কী কী তার অবদান? পরিকল্পিত অর্থনীতি বেকারির অবসান ঘটাবার চেষ্টা করে। ধরা যাক, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বহাল রেখেই বেকারিকে একটা ন্যূনতম স্তরে কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু বেকারির সম্পূর্ণ অবসান ঘটাতে কোন পুঁজিপতি কখনও রাজি হবে না। কারণ, মজুত বেকারবাহিনী থাকলেই শ্রমের বাজারে চাপ সৃষ্টি করা যায়, তাহলেই সস্তায় শ্রমিক পাওয়া সুনিশ্চিত হয়। এই হল বুর্জোয়া সমাজের 'পরিকল্পিত অর্থনীতির' একটা ফাঁকি। আবার দেখুন, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে একথা আগেই স্থির হয়ে যায় যে, শিল্পের যেসব শাখা জনগণের জন্য আবশ্যিক দ্রব্যগুলি উৎপাদন করে, সেখানে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটানো হবে। কিন্তু আপনি জানেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। যেখানেই সর্বোচ্চ মুনাফা, অর্থনীতির সেই শাখাগুলিতেই পুঁজি যাবে। জনগণের প্রয়োজন মেটাবার স্বার্থে আপনি কোন পুঁজিপতিকে লোকসান মেনে নিতে এবং কম হারে মুনাফা গ্রহণে বাধ্য করতে পারবেন না। পুঁজিপতিদের না হটিয়ে, উৎপাদনের উপকরণগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তিসম্পত্তির নীতি বিলোপ না করে পরিকল্পিত অর্থনীতি গড়ে তোলা অসম্ভব।

ওয়েলস্ ঃ আপনি যা বললেন, তার অনেকটার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমি যে বিষয়ে জোর দিতে চাইছি, তাহল একটি দেশ যদি সামগ্রিকভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির নীতি গ্রহণ করে, যদি সেই দেশের সরকার ক্রমশ ধাপে ধাপে, ধারাবাহিকভাবে এই নীতিকে প্রয়োগ করতে থাকে, তাহলে তো শেষপর্যন্ত ধনকুবের-গোষ্ঠীর বিলোপ ঘটবে এবং ব্রিটিশ ধারণা অনুযায়ী যে সমাজতন্ত্র — তা প্রবর্তিত হবে। রুজভেল্টের 'নিউ ডিল'-এর চিন্তাভাবনার প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আমার মতে, তা সমাজতান্ত্রিক চিন্তা। আমার মনে হচ্ছে, দুই বিশ্বের মধ্যে বিরোধের উপর জোর না দিয়ে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বরং সমস্ত গঠনমূলক শক্তিগুলির একটি সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

স্ট্যালিন ঃ পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বহাল রেখে পরিকল্পিত অর্থনীতির নীতিগুলির রূপায়ণ অসম্ভব — একথা বলার দ্বারা আমি কিন্তু রুজভেল্টের ব্যক্তিগত অসাধারণ গুণাবলী, তাঁর উদ্যোগ, সাহস এবং দৃঢ়তাকে এতটুকুও খাটো করতে চাই না। সমকালীন পুঁজিবাদী দুনিয়ার কর্ণধারদের মধ্যে নিঃসন্দেহে রুজভেল্ট সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বদের অন্যতম। সেজন্য আমি আবার জোর দিয়ে যেটা বলতে চাই, তাহল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে পরিকল্পিত অর্থনীতি অসম্ভব। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থ এটা নয় যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দক্ষতা, প্রতিভা এবং সাহস সম্পর্কে আমার কোনপ্রকার সংশয় আছে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি প্রতিকূল হয় তখন সবচেয়ে প্রতিভাবান কর্ণধারও, আপনি যে লক্ষ্যের কথা বলছেন, সেখানে পৌঁছতে পারে না। আপনি যাকে ব্রিটিশ পরিভাষায় সমাজতন্ত্র বলছেন — সেই লক্ষ্য অভিমুখে পুঁজিবাদের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে তত্ত্বগতভাবে বাতিল করা যায় না। কিন্তু সেই 'সমাজতন্ত্রে' কী হবে? লাগামহীন পুঁজিবাদী মুনাফাখোরদের উপর বড়জোর কিছুটা লাগাম পরানো যেতে পারে, জাতীয় অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ-নীতির প্রয়োগ আরও কিছুটা বাড়তে পারে। এ পর্যন্ত বেশ ভালই চলবে। কিন্তু যে মুহূর্তে রুজভেল্ট বা সমকালীন বুর্জোয়া দুনিয়ার কোন কর্ণধার পুঁজিবাদের মূল ভিত্তির বিরুদ্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে যাবেন, তখনই তার শোচনীয় পরাজয় অনিবার্য। ব্যাঙ্ক, শিল্প, বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থা, বৃহৎ জোত ইত্যাদি রুজভেল্টের হাতে নেই। এগুলো সবই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। রেল, পণ্যবাহী জাহাজ, সবকিছুই ব্যক্তি-মালিকানার অধীন। এবং সর্বোপরি, দক্ষ শ্রমিকবাহিনী, ইঞ্জিনিয়ারিং-টেকনিসিয়ান বাহিনীও রুজভেল্টের হাতে নেই, তারা ব্যক্তিমালিকের হুকুমে চলে, তারা সকলেই ব্যক্তিমালিকের অধীনে কাজ করে। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা আমাদের কখনই ভোলা উচিত নয়। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান যা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করে, 'শৃঙ্খলা' রক্ষার ব্যবস্থা করে; এটা ট্যাক্স আদায়ের যন্ত্র। অর্থনীতির পরিচালনা বলতে একেবারে আক্ষরিক অর্থে যা বোঝায়, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তা করে না; সেই অর্থে রাষ্ট্রের হাতে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ নেই। বিপরীতে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির হাতেই রয়েছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। সেইজন্যই আমার আশঙ্কা যে, প্রবল উদ্যম ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও রুজভেল্ট আপনার কথিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন না, অবশ্য যদি ওটাই তাঁর লক্ষ্য হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্মের চেষ্টার মধ্য দিয়ে এই লক্ষ্যের দিকে কিছুটা হয়ত যাওয়া সম্ভব হবে; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, তাও সম্ভব নয়।

ওয়েলস্ ঃ রাজনীতির পিছনে অর্থনীতির ভূমিকার উপর আমার বিশ্বাস হয়তো আপনার চেয়েও জোরালো। আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনগুলি যে বিপুল শক্তির জন্ম দিয়েছে তা সামাজিক সংগঠনকে এবং সকলের সম্মিলিত কর্মকাণ্ডকে উন্নততর করার অভিমুখে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজ পরিচালনার তত্ত্বগত ভিত্তি যাই হোক না কেন, পরস্পর মিলেমিশে কাজ, ব্যক্তির ক্রিয়াকে নিয়মের শাসনে আনা, যান্ত্রিকভাবেই প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিচ্ছে। যদি আমরা ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা দিয়ে শুরু করি, তারপর পরিবহন, বৃহৎ শিল্প ও সাধারণভাবে সকল শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি সবই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনি, তবে সেই সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় অর্থনীতির সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া হতে পারে। সমাজতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সাদা কালোর মতো একে অপরের বিপরীত নয়। এই দুয়ের মাঝে অনেক অন্তর্বর্তী স্তর আছে। এক ধরনের ব্যক্তিবাদ আছে যা প্রায় উচ্ছৃঙ্খলতা; আবার সুশৃঙ্খল ও পারস্পরিক সহযোগিতাও আছে, যা সমাজতন্ত্রের সমতুল। পরিকল্পিত অর্থনীতির রূপায়ণ বহুলাংশে অর্থনীতির পরিচালকদের উপর নির্ভর করে, দক্ষ প্রযুক্তিবিদদের উপর নির্ভর করে, যাঁদের ধাপে ধাপে সমাজতান্ত্রিক পরিচালন নীতিতে বিশ্বাসী করে ফেলা যায়। এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, আগে তার সাংগঠনিক কাঠামোটা তৈরি করা দরকার। এটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছাড়া সমাজতন্ত্রের ভাবনা নিছক ভাবনাই থেকে যায়।

স্ট্যালিন ঃ ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে, ব্যক্তির স্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে কোনও অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব নেই, থাকা উচিতও নয়। এই ধরনের কোন বিরোধ দেখা দেওয়ার কথা নয়, তার কারণ সমষ্টিবাদ, সমাজতন্ত্র ব্যক্তির স্বার্থকে অস্বীকার করে না, বরং সমষ্টির স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থকে মেলায়। সমাজতন্ত্র নিজেকে ব্যক্তিস্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই ব্যক্তির এইসব স্বার্থকে সবচেয়ে ভালভাবে পূরণ করতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই ব্যক্তির স্বার্থকে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষা দিতে পারে। এই দিক থেকে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোনও অনিরসনীয় বিরোধ নেই। কিন্তু আমরা কি শ্রেণীগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে — মালিকশ্রেণী-পুঁজিপতিশ্রেণী এবং শ্রমজীবী শ্রেণী-সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যকার বিরোধকে অস্বীকার করতে পারি? আমাদের একদিকে রয়েছে মালিকশ্রেণী, যারা ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, পরিবহন, উপনিবেশগুলিতে চা-বাগান ইত্যাদির মালিক; এরা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মুনাফালাভের মরিয়া চেষ্টার বাইরে অন্য কিছু দেখতে পায় না। সমষ্টির ইচ্ছার কাছে এরা নিজেদের সমর্পণ করে না, বরং প্রতিটি সমষ্টিকে নিজেদের ইচ্ছার অধীন করার চেষ্টা চালায়। অপরদিকে আমরা পাই গরিব, শোষিতশ্রেণীকে, যাদের না আছে নিজস্ব কল-কারখানা, না আছে ব্যাঙ্কের মালিকানা, বেঁচে থাকার জন্য যারা পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এদের নিজেদের অত্যাবশ্যক ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মেটাবার সুযোগ নেই। তাহলে, এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ ও প্রচেষ্টার যে পরস্পরবিরোধী চরিত্র, একে মেলানো যাবে কী উপায়ে? আমি যতদূর জানি, এই দুই বিপরীত স্বার্থের মিলন ঘটাবার কোন পথ রুজভেল্ট খুঁজে পাননি। অভিজ্ঞতা বলছে, এই মিলন অসম্ভব। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি আমার চেয়ে আপনি বেশি জানেন। কারণ আমি কখনও সেখানে যাইনি, বই ও পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে আমি আমেরিকার ঘটনাবলী দেখে থাকি। কিন্তু সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে, এবং সেই অভিজ্ঞতা আমায় বলে যে, রুজভেল্ট যদি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের ক্ষতি করে সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থ পূরণ করার জন্য প্রকৃত কোন চেষ্টা করেন, তাহলে পুঁজিপতিশ্রেণী তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে প্রেসিডেন্ট পদে বসাবে। পুঁজিপতিরা বলবে, প্রেসিডেন্টরা আসে, প্রেসিডেন্টরা যায়, কিন্তু আমরা বরাবরের জন্য থাকি। যদি এই অথবা ওই প্রেসিডেন্ট আমাদের স্বার্থ রক্ষা না করে, তাহলে আমরা অন্য কাউকে খুঁজে নেব। পুঁজিপতিশ্রেণীর এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কী করার ক্ষমতা আছে প্রেসিডেন্টের?

(চলবে)

ভ্যাট প্রসঙ্গে সরকারের মিথ্যাচার

একের পাতার পর

সরকার যেকোন মূল্যে, এমনকী ক্ষতিপূরণ দিয়েও ভ্যাট চালু করতে প্রবলভাবে আগ্রহী। অন্যদিকে কংগ্রেস, বি জে পি এবং সি পি এম, ভোটের ময়দানে পরস্পর একে অপরের বিরুদ্ধে যত বাক্যবাণই হানুক না কেন, সাধারণভাবে অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রশ্নে ও বিশেষভাবে ভ্যাটের প্রশ্নে তারা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করেছে। প্রকাশ্য রাজনীতিতে যখন সি পি এম জোর গলায় 'বি জে পি হঠাও' স্লোগান দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবার জমি তৈরি করছে, তখন বি জে পি সরকারই পরম আস্থায় ভ্যাট চালু করার জমি তৈরির গুরুদায়িত্ব সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রীর উপর দিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ভ্যাটের মধ্যে এমন কী আছে, এমন কাদের স্বার্থ আছে, যা পূরণ করা কংগ্রেস, বি জে পি এবং সি পি এম প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য বলে মনে করেছে ? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বলছে, ভ্যাট চালু হলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে না, বরং কমবে। এটা সত্য হলে মানতেই হয় যে, সি পি এম, কংগ্রেস ও বি জে পি — এদের মধ্যে পার্থক্য যাই থাক এবং এদের পতাকার রঙ যাই হোক, জিনিসপত্রের দাম কমাবার এবং জনগণের ক্লেশ লাঘব করার প্রচেষ্টায় এরা সকলেই সচেষ্ট। কিন্তু জনগণ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, শাসনক্ষমতায় বসে এই সমস্ত দলই মালিকশ্রেণীর স্বার্থ নগ্নভাবে দেখে চলেছে এবং এ ব্যাপারে ডান-বাম-গেরুয়া কোনও দলই কারো থেকে পিছিয়ে নেই। এদের এই মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী নীতির ফলেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই লাগামহীনভাবে বাড়ছে এবং জনজীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসছে। শাসক ও সংসদীয় বিরোধী দলগুলির এই চরম জনস্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক চরিত্রটি মাথায় রেখেই ভ্যাটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে হবে।

ভ্যাট কী

উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্তরে স্তরে, অর্থাৎ উৎপাদক, পাইকার এবং খুচরো বিক্রেতা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্তরে পণ্যে যে মূল্য যুক্ত করে, কেবলমাত্র তার উপর প্রদেয় করই হল ভ্যাট — যা বাস্তবে এখন বিক্রয়- করের বিকল্প হিসাবে আনা হচ্ছে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, 'মূল্য' শব্দটি এখানে পুঁজিবাদী পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে, যেভাবে সরকারি নথিপত্রে ব্যবহৃত হয়। 'মূল্য' শব্দটি যখন টাকার অঙ্কে ব্যক্ত হয়, তখন এর বাস্তব অর্থ হল, কেনা-দর ও বিক্রয়-দরের মধ্যে যে পার্থক্য, সেটা। সরকারি শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে — ''VAT is based on value addition to the goods and related VAT liability of the dealer is calculated by deducting input tax credit from tax collected on sales''. অর্থাৎ ''ভ্যাট হল পণ্যের মূল্যযুক্তির উপর নির্ভরশীল কর। কোন ব্যবসায়ীর বিক্রয়মূল্যের উপর আদায়ীকৃত কর থেকে ক্রয়মূল্যের উপর প্রদত্ত কর বিয়োগ করে ভ্যাট নির্ধারিত হবে''। ধরা যাক, কোন বিশেষ পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল বা প্রয়োজনীয় অন্য কোন মাল কিনতে কোন উৎপাদক ১ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন এবং তা থেকে বিক্রয়যোগ্য পণ্য তৈরি করে ২ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছেন। যদি ভ্যাট ক্রয়মূল্যের ওপর ৪% এবং বিক্রয়মূল্যের ওপর ১০% হয়, তাহলে ১ লক্ষ টাকার কাঁচামাল কিনতে তিনি ৪% হারে ৪০০০ টাকা ভ্যাট দিয়েছেন এবং উৎপাদিত পণ্য ২ লক্ষ টাকায় বেচার সময় ১০% হারে ২০ হাজার টাকা কর ক্রেতার কাছ থেকে নিয়ে তিনি সরকারকে দেবেন। বর্তমান এই ভ্যাট-এর নিয়মে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ক্রয়মূল্যের ওপর পণ্য উৎপাদক যে ৪ হাজার টাকা ভ্যাট বাবদ দিয়েছিলেন তা ফেরৎ পাবেন। ফলে সেই অনুযায়ী পণ্য ক্রেতার কাছ থেকে তিনি ২০ হাজার নয় ১৬ হাজার টাকা কর হিসাবে নেবেন।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, করমুক্ত কিছু পণ্য বাদ দিয়ে মোট ৫৫০টি পণ্য ভ্যাটের আওতায় আসছে। তার মধ্যে কিছু পণ্যের উপর ৪% ও বাকিগুলির উপর ১২.৫% হারে ভ্যাট বসানো হয়েছে। সরকারের মতে, যেহেতু ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকেই আগে কেনার সময় যে বিক্রয়কর দিত এবং যার কোন অংশই ফেরত পেত না, সে তুলনায় এখন দেওয়া করের একটা বড় অংশই ফেরত পাবে, তাই করের ভার কমবে। আবার বিক্রেতারা যদি কর হ্রাসের জন্য দাম কমায়, তবে জিনিসের দাম কমবে। অন্তত সরকার তাই-ই বলছে। যদিও বাস্তবে আজকাল তা ঘটে না। কারণ কর ছাড়ের সুযোগটা বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই সবসময় নেয় এবং নিজের নিজের মুনাফা বাড়ায়। কিন্তু সরকার যুক্তি দিচ্ছে, ভ্যাট চালু হলে ব্যবসায়ীদের কর কমবে, জিনিসপত্রের দামও কমবে। অথচ সরকারের আয় কমবে না, বরং বাড়বে। সরকার আরও বলছে, করদাতা নিজেই যেহেতু প্রতি বছর নিজের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের হিসাব থেকে ভ্যাট নির্ধারণ করবেন এবং হিসাব পেশ করবেন, কাজেই হিসাব রাখার পদ্ধতিও নাকি সহজ হবে।

ভ্যাটের বৈশিষ্ট্য কী এবং ভ্যাট চালু হলে কী কী সুফল ফলবে তার বিবরণ দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কমিটির শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে —

১। ব্যবসায়ীদের ক্রয়মূল্যের উপর ভ্যাট বাবদ প্রদত্ত কর ফেরত হবে।
২। টার্নওভার ট্যাক্স, সারচার্জ, অতিরিক্ত সারচার্জ উঠিয়ে দেওয়া হবে।
৩। সামগ্রিকভাবে করের ভার কমবে।
৪। সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম কমবে।
৫। ব্যবসায়ীরা নিজেদের আয়ব্যয়ের হিসাব নিজেরাই পেশ করবেন।
৬। দুর্নীতি কমবে।
৭। সরকারের আয় বাড়বে।

অথচ সরকার মনে করছে, এমন সর্বশুভকর একটা প্রচেষ্টার মূল্য সবাই বুঝছে না। দেখা যাচ্ছে, কেবল বৃহৎ পুঁজিপতিরা, নয়া আর্থিকনীতির প্রবক্তারা ভ্যাটের পক্ষে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা, দোকানদাররা ঘোরতরভাবে ভ্যাটের বিরুদ্ধে। তাঁরা ইতিমধ্যেই ২০০৩ সালের ১৫ মার্চ একদিন এবং ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল দু'দিনের ব্যবসা বন্ধ পালন করেছেন; এবছর ২১ ফেব্রুয়ারিও ২৪ ঘণ্টা ব্যবসা বন্ধ তাঁরা পালন করেছেন এবং আগামী দিনে আবার বনধ-এর কর্মসূচি নিচ্ছেন। জনগণও ভ্যাটের প্রশ্নে বিভ্রান্ত। এই সরকার যে জনগণের কোনও উপকার করবে না, এটা অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বোঝেন। কিন্তু ভ্যাটের আক্রমণটা ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছে, তা ধরতে না পারায় মানুষ গভীর আশঙ্কার মধ্যেই আছেন।

দু'ধরনের ক্রেতা/ দু'ধরনের দোকান

সকলেই লক্ষ্য করেছেন, স্বাধীনতা পরবর্তী ৫৭ বছরে একটানা পুঁজিবাদী শোষণে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ক্রমাগত গরিব হয়েছে এবং সমাজের আর্থিক অসাম্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে পুজিপতিদের মুনাফা বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে মধ্যবিত্তদের মধ্যে একটা অতিক্ষুদ্র অংশ ধনী ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যারা বর্তমান ভোগবাদী সমাজের জৌলুষের প্রতীক। এদের রুচি, ভাষা, চলাফেরা, ভোগের সামগ্রী, জীবনযাপন প্রক্রিয়া সবকিছুর মধ্যে ছাঁচে ঢালা সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। আর এর অপরদিকে রয়েছে অগণন নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও গরিব মানুষ, যাঁরা জীবনে বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপকরণগুলি থেকেও বঞ্চিত। মুষ্টিমেয় উঠতি ধনীদের মার্কেটিংয়ের জন্য ইদানীং সরকারি ও ব্যক্তিপুঁজির বিশেষ উদ্যোগে ভারতের শহরগুলিতে বিশেষ ধরনের জমকালো দোকান, রিসর্ট, রেস্তোরাঁ, বার, শপিং কমপ্লেক্স, শপিং মল ইত্যাদি গড়ে উঠছে। এগুলিতে এখন কেবল বৃহৎ দেশি পুঁজিই নয়, বিদেশি পুঁজিও ঢুকতে চাইছে। দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে কেন্দ্রীয় সরকারও খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে সম্মতি দিতে চলেছে।

কিন্তু এসব শপিং কমপ্লেক্সে সাধারণ মধ্যবিত্ত যায় না, গরিব মানুষের যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বাজারের সাধারণ দোকানের তুলনায় এসব শপিং কমপ্লেক্স, এয়ার কন্ডিশন্ড্ মার্কেটে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি। সাধারণ মানুষ হকার্স কর্নার বা ফুটপাত থেকে রেডিমেড জামা কেনেন, মধ্যবিত্তরা পাড়ার বা গঞ্জ এলাকার কোনও সাধারণ দর্জির দোকানে পোষাক তৈরি করান। কিন্তু অ্যারো, ভ্যান হিউসেন, মুস্টাসে, লিভাইসের ব্র্যাণ্ডেড পোষাক কেনেন মুষ্টিমেয় মানুষ ; কারণ, এগুলির দাম প্রচুর এবং যেসব বাছাই করা দোকানে এ ধরনের ব্র্যাণ্ডেড পণ্য বিক্রি হয়, সেখানে দামী জিনিসই বেশি। কিন্তু যদি এমন ব্যবস্থা নেওয়া যায় যে, সাধারণ দোকানে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের দাম বেড়ে ব্র্যাণ্ডেড জিনিস বা শপিং কমপ্লেক্সের দামের সমান বা কাছাকাছি চলে আসে, তবে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ বেশি দামে সেই সমস্ত জিনিস কিনতে বাধ্য হবে। ফলে বাধ্য হয়েই দামী দোকানে যাওয়ার প্রবণতা তাদের বাড়বে। উল্টো দিক থেকে দেখলে, সাধারণ দোকানে পণ্যের দাম বাড়াতে পারলে এসব চোখ ধাঁধানো দোকানে বিক্রি বাড়বে এবং খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি ঢালার সুযোগ বাড়বে। অর্থাৎ খুচরো বিপণনে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের রাস্তা পরিষ্কার হবে।

ভ্যাটের ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে

ফলে সরকার যে বলছে, ভ্যাটের ফলে দাম বাড়বে না, কর বাড়বে না — এর সবটাই পুরোপুরি মিথ্যা। ভ্যাটের ফলে দাম বাড়বেই। সরকারি শ্বেতপত্রে পরিষ্কার বলা আছে, কোন প্রতিষ্ঠানের বছরে কেনাবেচার পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি হলে তাকে ভ্যাটের আওতায় আসতে হবে। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যে সংস্থার ব্যবসা, ভ্যাটে আসা না আসা তার ইচ্ছাধীন। ভ্যাটে না এলে তেমন সংস্থাকে ০.২৫ শতাংশ কম্পোজিট লেভি দিতে হবে। কাজেই, সরকারের বক্তব্য, কোন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের আপত্তি থাকলে সে ভ্যাটে নাও আসতে পারে। কিন্তু সরকার যেটা বলছে না, তা হল, ভ্যাটে যে সংস্থা নথিভুক্ত হবে না, তার কাছে কেউ কাঁচামাল (ইনপুট) কিনলে, ক্রেতাকে যে ভ্যাট দিতে হবে, তা ফেরত পাওয়া অর্থাৎ ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া যাবে না। কাজেই ভ্যাটে নথিভুক্ত নয় এমন সংস্থার কাছ থেকে কেউ মাল কিনতে চাইবে না। ফলে কার্যত সকলকেই ভ্যাটের আওতায় আসতেই হবে, নয়ত ব্যবসা মার খাবে। অর্থাৎ, সপ্তাহে একদিন বন্ধের দিন হিসাবে ৫২ দিন বাদ দিয়ে বছরে ৩১৩ দিনে দৈনিক মাত্র ১৫৯৭ টাকা যার মোট বিক্রি, তেমন দোকানকেও এবার ভ্যাট দিতে হবে। দৈনিক ১৫৯৭ টাকা বিক্রিতে ১০ শতাংশ নিট লাভ হলে হয় ১৬০ টাকা, অর্থাৎ মাসে ২৬ দিনে ৪১৬০ টাকা। বর্তমানে টাকার দাম অস্বাভাবিক কমে যাওয়ায় মাসিক এই আয় ফুটপাতের দোকানদার, পান-বিড়ির দোকানদারেরও হয়ে থাকে। কাজেই বর্তমানে যারা সেলস্ট্যাক্সের আওতায় আসে না বা সেলস্ট্যাক্স দেয় না, তাদেরও ভ্যাট দিতে হবে। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাজার হাজার কোটি টাকা বকেয়া কর আদায় না করে, এভাবে করের আওতায় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ীকে বেঁধে যদি সরকার আয় বাড়াবার চেষ্টা করে, তবে মানুষ তা মানবে কেন? যদি ব্যবসায়ী ভ্যাট না দেন, এবং সেই সংক্রান্ত কাগজপত্র সরকারকে 'ঠিকমতো' না দেখান, তবে কেনার সময় প্রদত্ত কর (ট্যাক্স ক্রেডিট) তিনি ফেরত পাবেন না। কাজেই ভ্যাটের 'সুবিধা' নিতে গেলে ব্যবসায়ীকে কেনাবেচার সঠিক ও বেশ জটিল হিসাব রাখতে হবে, যেজন্য খরচ বাড়বে।

এর উপর কাগজপত্র পরীক্ষার (অডিট) নামে সরকারি ইন্সপেক্টরদের দৌরাত্ম্য এবং জবরদস্তি টাকা আদায় বাড়বে। কাজেই ভ্যাটের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী নিজের কর নিজেই নির্ধারণ করার (সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট) সুযোগ পাবে বলে সরকার যে বলছে, তা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের কল্যাণে আতঙ্কে পর্যবসিত হবে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে কর-প্রশাসনের অকল্পনীয় দুর্নীতি দূর করার কোনও চেষ্টা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের নেই। অথচ তারাই দুর্নীতিমুক্ত ভ্যাটের খোয়াব দেখাচ্ছে।

ভ্যাটের জটিল হিসাব রাখতে খরচ বাড়বে

দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকায় সেলস্ ট্যাক্সের খাতা লেখার জন্য অভিজ্ঞ একদল পেশাজীবী ইতিমধ্যেই দেশে গড়ে উঠেছে, যাঁরা সামান্য মজুরিতে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর হিসাবের খাতা লিখে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করেন। ভ্যাটের ফলে সাধারণ মানুষের এই উল্লেখযোগ্য অংশ কাজ হারাবেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অভিযোগ হল, বৃহৎ পুঁজির মালিকদের পক্ষে দক্ষ কর্মচারী ও কম্পিউটারের সাহায্যে ভ্যাটের নিয়ম মোতাবেক হিসাব রাখা কঠিন নয়। এজন্য তাদের বিশেষ বাড়তি ব্যবস্থা করতে হবে না। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এজন্য বাড়তি খরচের ধাক্কায় পড়বেন। লক্ষণীয়, ইতিমধ্যেই কম্পিউটার সফ্টওয়্যার কোম্পানি ভ্যাটের হিসাব রাখার জন্য তাদের তৈরি বিশেষ সফ্টওয়্যারের বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছে। এ থেকেই পরিষ্কার যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর

পাঁচের পাতায় দেখুন

রাজ্য কমিটির বিবৃতি

একের পাতার পর

দেওয়াই ভ্যাটের প্রধান উদ্দেশ্য।

"আমরা মনে করি, ভ্যাট চালু হলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্সের বোঝা বৃদ্ধি পাবে, ঘুষের মাত্রা বাড়বে এবং ব্যাপকহারে সব জিনিসের দাম বেড়ে যাবে। আমরা অবিলম্বে এই জনস্বার্থবিরোধী ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

"এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সি পি আই (এম) বহুজাতিক সংস্থা এবং একচেটিয়া পুঁজির আরও বেশি আস্থা দ্রুত অর্জন করে রাজ্য সরকারি ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভাগিদার হওয়ার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার জন্যই ভ্যাটকে দ্রুত কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছে।

"আমরা ভ্যাট সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার না-হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং তাকে ব্যাপকতর ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সাধারণ মানুষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন করছি।"

ইরাকে মার্কিন তাণ্ডব

ফালুজা — প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

[গত নভেম্বর মাসে ইরাকের অবরুদ্ধ শহর ফালুজাকে জঙ্গিমুক্ত করার অজুহাতে মার্কিন বাহিনী যখন সামরিক অভিযান চালায়, তখন মুষ্টিমেয় যে কয়জন ডাক্তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফালুজায় থেকে গিয়েছিলেন, মহম্মদ জে হাদেদ তাঁদেরই একজন। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি জার্মান দৈনিক ইয়ুঙে ভেল্ট (যুববিশ্ব)-এ তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারটির সঞ্চালক ছিলেন রুডিগার গ্যোবেল। মূল জার্মান ভাষায় প্রকাশিত সেই সাক্ষাৎকারের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করা হল।]

নভেম্বর মাসে যখন মার্কিন বাহিনী ফালুজায় বড়সড় আক্রমণ শুরু করে তখন অনেক মানুষ নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে পারলেও সবাই পারেননি। প্রায় ৫০০০ পরিবার, অর্থাৎ প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার সাধারণ ইরাকি তখনও শহরেই থেকে গিয়েছিলেন। পরে, আক্রমণের তেজ খানিকটা কমে এলে, যাঁরা চলে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও অনেকে ফিরে আসেন। সংখ্যায় তাঁরাও শহরের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ।

তখন অবশ্য শহরের অবস্থা শোচনীয়। শহরের যে সব বাড়ি ঘরদোর বা বহুতল বাড়ি সরাসরি মার্কিন বোমার হাত থেকে কোনওভাবে রেহাই পেয়েও গিয়েছিল, আগ্রাসন পরবর্তী ধ্বংসের হাত থেকে সেগুলিও বাঁচেনি। সেসব বাড়ির আসবাবপত্র টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এছাড়াও অনেক বাড়িতে পরিকল্পনামাফিক আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরনের নাশকতার হাত থেকে এমনকী স্কুল বা হাসপাতালগুলিরও রেহাই মেলেনি।

এইসব বাড়ি ঘরদোরের ধ্বংসস্তূপ থেকে এমনকী এখনও পর্যন্ত মাঝে-মাঝেই মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও বহু মৃতদেহ মার্কিন বাহিনীই ইউফ্রেটিস নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, যার সঠিক সংখ্যা অনুমান করা শক্ত। অবশ্য মার্কিন কর্তৃপক্ষের দাবি মতো এই অভিযানে মৃতের সংখ্যা মাত্র ১২০০। আমরা নিজেরাই বিভিন্ন স্থান থেকে ৭০০-রও বেশি মৃতদেহ উদ্ধার করেছি এবং সৎকার করেছি। সঠিক তথ্য অর্থে এটুকুই আমার পক্ষে বলা সম্ভব।

আমাদের কাছে অসংখ্য ছবি আছে — যা থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন, কারা এই সামরিক অভিযানে মূলত মারা পড়েছেন। আমি সকলকে শহরে আসতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি আপনাদের সেইসব শিশুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, যাদের চোখের সামনেই মার্কিন সেনারা তাদের বাবা-মাকে গুলি করে মেরেছে। এমন মানুষও আছেন যাঁদের নিজের চোখে দেখতে হয়েছে কীভাবে তাঁদের স্ত্রী ও শিশুপুত্রদের খুন করা হচ্ছে।

ইরাকে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে। এমনকী ধ্বংসস্তূপে পরিণত ফালুজাতেও প্রতিরোধ চলছে। মার্কিন দখলদারির বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ আন্দোলন যথেষ্ট ন্যায্য এবং এই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নিয়মনীতিও তার বিরোধী নয়। কিন্তু, কোনওভাবেই অসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সরাসরি আগ্রাসন আইনি বা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। এটা যেমন আমেরিকানদের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনই সত্য দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের ক্ষেত্রেও।

সাম্প্রতিক নানা ঘটনায় সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তিহানির দায় প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের উপর ঠিক বর্তায় না। বরং এইসব নিরীহ মানুষের রক্তপাতের দায়ও বহুলাংশেই আমেরিকানদের ও তাদের সহযোগী নানা দেশের গোয়েন্দা সংস্থার — বহু ইরাকি এ কথাই মনে করেন। একই কথা বলা চলে মুসাব আল-জারকোয়াই সম্পর্কেও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই আল কায়দা নেতার নাম করেই আমেরিকা তার ফালুজা অভিযানকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই আল জারকোয়াই এখন কোথায়? সে এমনই এক ভূতুড়ে লোক, যখন যেখানে আমেরিকানদের তাকে দরকার, তখন সেখানেই সে হাজির হয়। কিরকুকই হোক, বা মসুল, তিকরিত, সামারা, রামাদি, বাগদাদ বা বসরা —যেখানেই প্রতিরোধ দানা বাঁধতে থাকে, সেখানেই তার উদয় ঘটে; সেখানেই নিরীহ মানুষের রক্তপাত ঘটে এবং আমেরিকানরা তাকে অজুহাত করে আন্দোলন দমনে নেমে পড়ে।

ফালুজা শহরের হাসপাতালটি পশ্চিমে অবস্থিত এবং মূল শহর থেকে ইউফ্রেটিস নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ৮ নভেম্বর (এই দিনই মার্কিন বাহিনী শহরকে জঙ্গিমুক্ত করতে তাদের আগ্রাসন 'অপারেশন ডন' শুরু করে) সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটিকে মার্কিন সৈন্যরা ঘিরে ফেলে ও দখল করে নেয়। সেই সময় হাসপাতালে প্রায় ৩০ জন রোগী ভর্তি ছিলেন, যদিও সেখানে তখন কোনও প্রতিরোধের চিহ্ন ছিল না, বা ধারে-কাছে কোন জঙ্গিও ছিল না। তা সত্ত্বেও উপস্থিত ২২ জন চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্মীকেই সাথে সাথে তারা গ্রেপ্তার করে। প্রথমে ধাক্কা মেরে আমাদের মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় এবং তারপরে শক্ত করে বেঁধে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। আমাদের বলা হয়, রোগী ও চিকিৎসক নির্বিশেষে সকলকে হাসপাতাল খালি করে চলে যেতে হবে। পরে গোটা হাসপাতালটিকেই ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। এমনকী সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে চিকিৎসার যন্ত্রপাতিগুলিরও পরিত্রাণ মেলেনি।

আমাদের অবস্থা তখন করুণ। আমেরিকানরা হাসপাতালে ঢুকে পড়েছে, সবকিছু তছনছ করে দেখছে। আমাদের বারবার জিজ্ঞাসা করা হতে থাকে, কোথায় সন্ত্রাসবাদীরা লুকিয়ে আছে। যদি তারা সেদিন কোনওভাবে সেখানে কাউকে খুঁজে পেত, যার সাথে প্রতিরোধ আন্দোলনের সামান্যতম যোগও আছে, তবে আমরা, মানে ডাক্তাররা, কেউই আর কোনদিন মুক্তজীবনে ফিরে আসতে পারতাম না।

ঠিক যে সময়ে তারা হাসপাতাল দখল করে, ঠিক সেই সময়ই সারা শহর জুড়ে শুরু হয়ে যায় তুমুল বোমাবর্ষণ। বিস্ফোরণের শব্দ বহুদূর পর্যন্ত শোনা যেতে থাকে। এমনকী উদ্ধারকারী গাড়িগুলোকে লক্ষ্য করেও গোলা ছোঁড়া হতে থাকে। প্রথমদিকে নাগরিকরা চেষ্টা করেছিলেন আহতদের সাধারণ গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। কিন্তু রাস্তার উপর সবরকমের যানবাহনই আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হওয়ায়, সেই চেষ্টাতে বাধ্য হয়েই ছেদ টানতে হয়।

শেষপর্যন্ত শহরের পূর্বপ্রান্তে আমরা একটা ফিল্ড হসপিটাল চালু করতে সক্ষম হই। অবশ্য বাস্তবিক-পক্ষে সেটা একটা আউটডোর ক্লিনিকের বেশি কিছু ছিল না। আমরা এর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে আমেরিকানদের আগে থেকেই অবহিত করেছিলাম। তা সত্ত্বেও দুদিন বাদে এর উপর সরাসরি বোমা ফেলা হয়। ফলে এই এমার্জেন্সি ব্যবস্থাটিও ধ্বংস হয়ে যায়। যাই হোক, আমরা শেষপর্যন্ত আরেকটি জরুরি হাসপাতাল চালু করতে সক্ষম হই, সেটিও নামেই ছিল হাসপাতাল। কারণ সত্যি বলতে আমাদের হাতে চিকিৎসার প্রায় কোনও উপকরণই ছিল না। জল এবং বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, টেলিফোনও আর কাজ করছিল না।

পরিস্থিতি ছিল অসহনীয় ও মর্মন্তুদ। তা সত্ত্বেও আমরা সেখানে অন্তত ২৫ জনের অপারেশন করেছিলাম। কিন্তু আমাদের হাতে কোনও ওষুধ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতস্থানগুলি দ্রুত পেকে যাচ্ছিল। ফলে রোগীদের কাছে ঐ হাসপাতাল মৃত্যুশয্যায় পরিণত হচ্ছিল। যাদের ক্ষত গুরুতর, তাদের জীবনের কোনও আশাই থাকছিল না। তবে আশপাশের বাড়ি থেকে সাধারণ লোকেরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল সাহায্য করতে। তারাই ধোয়ামোছা করে, রক্ত পরিষ্কার করে হাসপাতালটিকে চালু রেখেছিল। আমার ১৩ বছর বয়সী ছেলেও এই কাজে হাত দেয়।

সাতের পাতায় দেখুন

ভ্যাট ঃ বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম এককাট্টা

চারের পাতার পর

ভ্যাটের আঘাত কোথায় এবং কতটা। প্রথমত, কম আয়ের ক্রেতাদের ধরার জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনেকেই এতদিন পণ্যের দাম যথাসম্ভব কম রেখে বিক্রির পরিমাণ বাড়িয়ে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রোজগারের চেষ্টা করতেন। ভ্যাটের জালে আটকে পড়ায় তাঁরা আর সেভাবে দাম কমিয়ে রাখতে পারবে না। ভ্যাট দিতে হলে এবং তার সঠিক হিসাব রাখার খরচের ভার এসে চাপলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পণ্যের দর বেড়ে যাবে, ব্র্যাণ্ডেড পণ্য ও শপিং কমপ্লেক্সের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা হঠে যাবেন। সাধারণ রেডিমেড পোষাকের দোকানকে যদি একই দামের বা কাছাকাছি দামের পোষাক নিয়ে প্যান্টালুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, তবে ফল কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। এক কথায়, ভ্যাটের অন্যতম লক্ষ্য হল, করের এবং জটিল অ্যাকাউন্টের জালে আটকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া এবং দাম কমিয়ে রাখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেওয়া। অন্যদিকে বৃহৎ পুঁজিপতিদের উপর করের ভার লাঘব করা। বলা বাহুল্য, এর ফলে খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির প্রবেশ ঘটবে এবং সেই পথে বিদেশি পুঁজির প্রবেশ সহজতর হবে এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্ন আয়ের মানুষকে তার মাশুল দিতে হবে। তাদের বাধ্য করা হবে বেশি দামে কিনতে এবং ব্র্যাণ্ডেড পণ্য কিনতে। স্বভাবতই ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় চাপে ইতিমধ্যেই ন্যুব্জ হয়ে যাওয়া গরিব-মধ্যবিত্তের জীবনে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসবে।

ভ্যাটের ফলে করের ভার বাড়বে

ভ্যাটের ফলে সরকারের আয় কী করে বাড়বে তা ব্যাখ্যা করে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যা বলেছেন, তাতে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। তিনি বলেছেন, আগে যেসব পণ্য বিক্রয়করের আওতায় ছিলনা সেগুলিও ভ্যাটের আওতায় আসবে। এ যাবৎ ১০০টি পণ্য বিক্রয়করের আওতার বাইরে ছিল, ভ্যাটে মাত্র ৪৬টিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিক্রয়করের তুলনায় অনেক বেশি পণ্য ভ্যাটের আওতায় আসবে। এরই একটা নিদর্শন হল ওষুধ। অতীব প্রয়োজনীয় ওষুধ বিক্রয়করের আওতার বাইরে ছিল, এখন তা ৪% ভ্যাটের আওতায় আসবে। তাছাড়া এ রাজ্যে গড়ে বিক্রয়করের হার ছিল ৮%, সেটা বেড়ে অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাটে ১২.৫% হবে। অর্থাৎ সাধারণভাবে করের হার বেড়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে। হরিয়ানা রাজ্যে ২০০৩-০৪ থেকে ভ্যাট চালু হয়েছে। প্রথম বছরেই সে রাজ্যে ২৮.৫ শতাংশ রাজস্ব বেড়েছে। অর্থাৎ করের ভার বেড়েছে, যার ফলে মূল্যবৃদ্ধি না ঘটে পারে না।

বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষায় অগ্রণী সি পি এম

অত্যন্ত লজ্জার কথা, মুখে খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি, তথা বিদেশি পুঁজির প্রবেশের বিরোধিতা করতে করতেই, গরিব-মধ্যবিত্তের জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসার কাজে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে সি পি এম। আমরা আগেই দেখিয়েছি, এমনকী বি জে পি পরিচালিত এন ডি এ সরকার, ভ্যাট চালু করার জমি তৈরির গুরুদায়িত্ব দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর উপর। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন বি জে পি সরকারের সবচেয়ে আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত। অসীম দাশগুপ্ত কৃতজ্ঞভাবে প্রতিদান দিয়েছেন। শ্বেতপত্রে পূর্বতন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীদের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কেবল মনমোহন সিং বা চিদাম্বরমই নন, শ্বেতপত্রের ভূমিকায় তিনি বি জে পি'র যশোবন্ত সিং এবং যশোবন্ত সিনহা উভয়েরই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ''পূর্বতন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীরা কেউই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের উপর চাপিয়ে দেননি''। কাজেই ন্যূনতম সততা থাকলে ভ্যাটের পরিণামের জন্য তাঁরা কেন্দ্রকে দায়ী করতে পারবেন না। যদিও আসন্ন ভোটের সামনে তাঁরা তাঁদের ন্যূনতম সততা রক্ষা করবেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ তাঁদের অতীত একথা বলেনা।

প্রবন্ধের শুরুতে আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, ভ্যাটে এমন কী আছে, এমন কাদের স্বার্থ আছে, যা পূরণ করা কংগ্রেস, বি জে পি বা সি পি এম সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য বলে মনে করছে। আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, বৃহৎ পুঁজির স্বার্থই, ভোটের ময়দানে পরস্পর বিবদমান এই দলগুলিকে এক সুরে বেঁধেছে। কারণ, বর্তমানে আমাদের দেশে তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রে কোন্ দল বা জোট ক্ষমতায় যাবে তা বৃহৎ পুঁজিই নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের অর্থ ও সমর্থন ছাড়া কারোর পক্ষেই নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় যাওয়া বা টিকে থাকা সম্ভব নয়।

বিজেপি-তৃণমূলের ভ্যাটবিরোধিতা প্রতারণামাত্র

তাই দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রের ক্ষমতায় বসে কংগ্রেস প্রথম ভ্যাট চালু করার যে পরিকল্পনা করেছিল, বিজেপি ক্ষমতায় বসে তাকেই কার্যকরী করার উদ্যোগ নেয় এবং এন ডি এ-র শরিক হিসাবে তৃণমূল তখন তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। এখন সেই বিজেপিই যেসব রাজ্যে ক্ষমতাসীন সেখানে তারা ভ্যাট চালু করবে না বলছে এবং তৃণমূল এখন ভ্যাটের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলে বাজার গরম করছে। এই নির্লজ্জ দ্বিচারিতাই প্রমাণ করে তাদের এই বিরুদ্ধ অবস্থানের পিছনে সংকীর্ণ সংসদীয় স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু নেই। এ হচ্ছে পরিষদীয় রাজনীতির বিরোধিতা; না হলে দলগতভাবে এরা সকলেই জনগণের বৃহৎ পুঁজির স্বার্থের ধারক ও বাহক। ভ্যাটের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ও বিরূপ মনোভাব লক্ষ করে ভবিষ্যতে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষকে ধোঁকা দেওয়াই তাদের ভ্যাটবিরোধী জেহাদের আসল কথা। এদের সম্পর্কে সতর্ক না থাকলে মানুষকে আবার ঠকতে হবে। কারণ ভ্যাট চালু করা কেবল কর-কাঠামোর সংস্কার নয়, ভ্যাট হল বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে রচিত নয়া আর্থিক নীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা রূপায়ণ করতে শাসক ও সংসদীয় বিরোধী দলগুলি মালিকশ্রেণীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাজ্য সরকারের গরিব দরদী(!) বাজেট

একের পাতার পর

প্রস্তাবিত ১০,৫৭২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তা নিয়ে অর্থমন্ত্রী ব্যাখ্যা দেওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করেননি।

যদিও হার্ভার্ড ফেরৎ অসীমবাবু দমবার পাত্র নন, অত্যন্ত আশাবাদী। চলতি বছর সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী বিক্রয় কর খাতে ৫,৫৫৫ কোটি টাকা আদায় হলেও আগামী বছর তিনি এই খাতে ৬,৫০২ কোটি টাকা আয় দেখিয়েছেন, যা ১৭ শতাংশ বেশি। তাঁর এই বক্তব্যটি ঠিক হলে, ভ্যাটের কারণে বর্ধিত করজনিত মূল্যবৃদ্ধি যে ঘটবেই — সেটি কিন্তু তিনি বলেননি।

নতুন কোন করের প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী করেননি। কিন্তু বিভিন্ন খাতে তিনি বরাদ্দ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে, জমির সিলিং-এর বাইরে জমি কেউ বিক্রি করতে চাইলে সরকার বাজার দামে তা কিনে নেবে এবং বিনামূল্যে সেই জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করবে। এর জন্য বাজেটে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ৭৮ লক্ষ। ইতিমধ্যে তা আরও বেড়েছে। কিন্তু মাত্র ২০ কোটি টাকায় (অর্থাৎ মাথাপিছু ২০ টাকার সামান্য বেশি) ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে কতজনের হাতে কত বিঘা জমির পাট্টা তুলে দিতে পারবেন সে হিসাব অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার করে রাখেন নি। তবে এটা পরিষ্কার যে, সব ভূমিহীন চাষী জমি পাবে না। এ অবস্থায় যে সামান্য কিছু ভূমিহীন চাষী জমি পাবে, যদি শেষপর্যন্ত পায়ও, তবে তারা কারা? অবশ্যই শাসকদলের অনুগত কিছু ব্যক্তিই তা পাবে। ফলে এ নিয়ে চলবে নিকৃষ্ট দলবাজি এবং সিপিএমের ভোটব্যাঙ্ক তৈরি।

বাজেটে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য ৫০ কোটি টাকা এবং শহরাঞ্চলের কর্মসংস্থানের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্কুল-কলেজে এবং সরকারি ক্ষেত্রে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ বন্ধ করে স্থায়ী চাকরির আশ্বাস বাজেটে দেওয়া হয়েছে। সব জুনিয়ার হাইস্কুলকে মাধ্যমিক স্তরে আনার ঘোষণা বাজেটে রয়েছে। গ্রাম-শহরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছয় লক্ষ কর্মসংস্থানের আশ্বাস অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন।

বাজেটে প্রস্তাব এবং কার্যক্ষেত্রে খরচ এই দুইয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। যদি ধরেও নেওয়া যায় সরকার এই টাকাটা খরচ করবে তাহলে তা মূল সমস্যার কতটুকু লাঘব করতে পারবে? রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে আর্থিক সমীক্ষায় এমন তথ্যই পেশ করা হয়েছে। সমীক্ষার হিসাবে বলা হয়েছে, ১৯৯০ সালে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ৪৮ লক্ষের একটু বেশি। ২০০৪ সালে সেটাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯ লক্ষ ৯০ হাজারের বেশি — অর্থাৎ প্রায় ৭০ লক্ষের কাছাকাছি। কর্মসংস্থানের যে চিত্রটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে তা যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৯০ সালে যেখানে ১৮ হাজারের মত চাকরির সুযোগ ছিল, গত বছর তা নেমে দাঁড়ায় ৭ হাজারে। গত বছর এ রাজ্যে মাধ্যমিক পাশ করা বেকারের সংখ্যা সরকারি হিসাবে ২ লক্ষ ৩ হাজার ৫৯, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা বেকারের সংখ্যা ১২ হাজার এবং মেডিকেল পাশ বেকারের সংখ্যা ২ হাজারের বেশি। বেকারের সংখ্যা ৭০ লক্ষের কাছাকাছি হলেও ২০০৪ সালে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৭ হাজার নথিভুক্ত বেকারের চাকরি হয়েছে। গ্রামের কয়েক কোটি বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যাটা সরকারের জানা থাকলেও গরিব দরদি(!) সিপিএম সরকারের আর্থিক সমীক্ষায় তা ঠাঁই পায় না।

সমস্ত পরিকল্পনাগুলির ব্যয় যুক্ত করলে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ দাঁড়াবে বর্তমান বছরে ৪,১৮৪ কোটি টাকা থেকে ৭,০৫১ কোটি টাকায়। অর্থাৎ এই খাতে ২,৮৬৭ কোটি টাকা, শতাংশের হিসাবে ৬৮ শতাংশ বরাদ্দ অর্থমন্ত্রী বাড়িয়েছেন। এই পরিমাণ বরাদ্দবৃদ্ধিকে মন্ত্রীমহোদয় অভূতপূর্ব বলে দাবি করেছেন। এ দাবি তিনি যদি নাও করতেন তবু 'অভূতপূর্ব' বলে অনেকেই মেনে নেবে। কিন্তু আয় না-দেখিয়ে, ব্যয় সংকোচন না-করে এই বাড়তি বরাদ্দের সংস্থান অর্থমন্ত্রী কোথা থেকে করলেন, এটা স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে। অথচ বিপুল অপচয়, দুর্নীতি, মাথাভারি প্রশাসনিক ব্যয়, মন্ত্রীদের বিলাসব্যসনের খরচ কমিয়ে আয়বৃদ্ধির সুযোগ ছিল। যে রাজ্যে কর্মহীন শ্রমিক ও সর্বস্বান্ত কৃষক আত্মহত্যা করছে, ভাঙনদুর্গত মানুষ সহ অসংখ্য মানুষ দু-বেলা খেতে পায় না; অর্ধাহারে থাকে, না-খেয়ে মরে, সেখানে ব্যয়সঙ্কোচ করে সেই টাকা গরিবের স্বার্থে খরচ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু 'গরিবদরদি' রাজ্য সরকার সে পথে যায়নি। ব্যয়সঙ্কোচ না-করেই আয়বৃদ্ধি ছাড়াই ব্যয়বৃদ্ধির আশ্বাস তারা দিয়েছে। কিন্তু ভোজবাজিতে তো আর বিশ্বাস করা যায় না। অর্থমন্ত্রী কথিত অভূতপূর্ব বরাদ্দবৃদ্ধির আসল রহস্যটা বোঝা গেল, যখন দেখা গেল প্রায় একই পরিমাণ অর্থ ২,৭৭১ কোটি টাকা দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অনুদান হিসাবে রাজ্য সরকারের হাতে আসবে। সেটাই বাজেটে বাড়তি ব্যয়বরাদ্দের দাবা খেলায় বোড়ের চাল। এককথায় এই অনুদানের অঙ্কটি বাড়তি যোজনা ব্যয়ের প্রায় সমান সমান।

আগামী ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে অর্থমন্ত্রী যোজনা বা পরিকল্পনা খাতের টাকা কৃষি, সেচ, ক্ষুদ্রশিল্প, শিক্ষা, স্বনিযুক্তি, গ্রাম-শহরে গরিব মানুষের জন্য স্বাস্থ্যবীমায় খরচ করলে আপত্তির কিছু নেই, যদি পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পরিকল্পনার একটি পরিষ্কার চিত্র বা দিশা পাওয়া যেত। কোন দিশা বা মেয়াদি পরিকল্পনা রাজ্য বাজেটে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এবারে মূলধনী খাতে ব্যয় চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বা ১৯ শতাংশ কম। সাধারণভাবে মূলধনী খাতে ব্যয় মানে হল, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি বা লগ্নীজনিত খরচ, যা থেকে সরকারের কিছু আয় হতে পারে। চলতি খাতে ব্যয় হল বেতন, ভাতা, প্রশাসনিক খরচ ইত্যাদি। অবশ্য চলতি খাতে ব্যয় হলে উন্নয়ন কম হয়, আর মূলধনী খাতে ব্যয় মানেই উন্নয়ন — এমন অতি সরলীকৃত সমীকরণ বা হিসাব বাদ দিলে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সব অনুদান চলতি খাতে ঢেলে সবটা ভোটের লক্ষ্যে ব্যয় করলে বাজেটের লক্ষ্য দিশাহীন হয়ে পড়ে, সেটা এবারের বাজেটে স্পষ্ট হয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, তিনি পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছেন, কিন্তু তিনি একবারও বলছেন না যে, মূলধনী খাতে বরাদ্দ কমিয়েছেন। এক হাতে বরাদ্দ কেটে অন্য হাতে বরাদ্দ বাড়ানোর জাগলারির খেলা অসীমবাবু বাজেটের মধ্যে দিয়ে দেখাতে পেরেছেন।

বছরের পর বছর ঘাটতিশূন্য বাজেট পেশের ভেল্কিবাজি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর এবছর অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, এবারের বাজেটের মধ্য দিয়ে তিনি নাকি আর্থিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করেছেন। বলেছেন, বাজেটে আয়বৃদ্ধির হার ব্যয়বৃদ্ধির থেকে বেশি। কিন্তু যা তিনি স্বীকার করেননি, তাহল গোটা বাজেটে হিসাবের জাগলারির মধ্যে দেউলিয়াপনা বা ব্যাঙ্করাপ্সির সমস্ত চিহ্নই ফুটে উঠেছে। যেমন কর ও করবহির্ভূত খাতে আয় ১১,৭৩৬ কোটি টাকা। প্রায় পুরোটাই খরচ হয়ে যাবে ১০,৩৬৬ কোটি টাকার সুদ গুণতে। কারণ সমস্ত ঋণের পরিমাণ একসঙ্গে যোগ করলে তা ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। আসলে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' কখনও সরকারি নীতি হতে পারে না। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় যতই লম্পঝম্প-গলাবাজি করুন না কেন, তাঁর ন্যূনতম খরচ চালাতে হচ্ছে হয় কেন্দ্রের অনুদান নিয়ে, নয়তো ঋণ করে। এই সত্য এবারের বাজেটে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

	প্রকৃত (০২-০৩)	প্রস্তাবিত (০৩-০৪)	সংশোধিত (০৩-০৪)	প্রস্তাবিত (০৪-০৫)	সংশোধিত (০৪-০৫)	প্রস্তাবিত (০৫-০৬)
রাজস্ব ঘাটতি	৮,৬৩৫	৮,৭৭৭	৯,৩৭৫	৭,৩০০	৮,৯৫৮	৭,০২৩
রাজকোষ ঘাটতি	১০,৫৬৯	১২,২৭৩	১৩,৩২৪	১০,২৫০	১১,৮৭৫	১০,৫৭২
সামগ্রিক ঋণ	৭৬,৫৯৮	৮৮,৪৮০	৮৮,৯৪৭	৯৯,২০৫	৯৯,৬৭৫	১,১০,২৫৯

এঙ্গেল ইন্ডিয়া ও ওয়েস্টবেঙ্গল কেমিক্যালস

একের পাতার পর

একদিকে যেমন সংস্থার কর্মীদের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হয়নি, তেমনই হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বেআইনি লেনদেনের অভিযোগও প্রথম থেকেই শোনা যাচ্ছিল। সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল, বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত বিল পেশ হওয়ার সময়ে রাজ্যের শিল্প ও শিল্প পুনর্গঠন মন্ত্রী নিরুপম সেন বিধানসভায় বিরোধীদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন। অথচ ২২ মার্চ বিধানসভায় বিল পেশ হওয়ার সময়ে শিল্প ও শিল্পপুনর্গঠন মন্ত্রী অসুস্থতার কথা বলে অনুপস্থিত থাকলেন। এই পরিস্থিতিতে নিরুপমবাবুর অনুপস্থিতিতে বিলটির অনুমোদন না করিয়ে আগামী সপ্তাহে যে কোন দিন এক ঘণ্টা সময় নিয়ে আলোচনা করার দাবি জানায় বিরোধী সদস্যরা। কিন্তু বিরোধীদের কথায় কর্ণপাত না করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল নির্দিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী ছাড়াই আইন ও বিচারমন্ত্রী নিশীথ অধিকারীকে দিয়ে পেশ করান হয়। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই চরম অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার সহ বিরোধী সদস্যরা বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন।

এমতাবস্থায় যে প্রশ্নগুলি স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে তা হ'ল, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিরোধীদের কোন মতামত সরকার নিল না কেন? দ্বিতীয়ত, এই হস্তান্তর নিয়ে এত ঢাক-ঢাক গুড়গুড় কেন? হস্তান্তর নিয়ে বিরোধী দল সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা নিরসনের জন্য বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কোন জবাবদিহি করলেন না কেন? সকলেই জানেন, সিপিএম সহ সরকারি বামপন্থী দলগুলি কংগ্রেস-বিজেপি'র বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণ নীতির তীব্র সমালোচক; তাঁরা বলেন, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণের তাঁরা ঘোর বিরোধী; এমনকি রুগ্ন শিল্পের হস্তান্তরের সময়েও শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষা করাই নাকি তাঁদের দাবি। অথচ কেন এই সংস্থাগুলি রুগ্ন হয়ে পড়ল, তার জন্য দায়ী কারা, বা সেই রুগ্নতা কাটানোর জন্য সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছিল, অথবা সত্যিই যদি সংস্থাগুলি রুগ্ন হয় তবে বেসরকারি শিল্পসংস্থাগুলি কোন্ স্বার্থে এগুলি কিনে নিল অর্থাৎ কোন্ পরিস্থিতিতে উক্ত সংস্থাদুটিকে তাঁরা বিলগ্নীকরণ করলেন তা তাঁরা রাজ্যের মানুষ এমনকী বিধান সভাকেও জানালেন না। এ ব্যাপারে সত্যিই যদি তাঁরা স্বচ্ছ হতেন, অর্থাৎ সমগ্র লেনদেনটি যদি সোজা পথে হতো, তবে এ নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা করতে তাঁরা ভয় পেতেন না। দ্বিতীয়ত, কর্মীসংকোচন ছাড়া ডি এফ আই ডি'র সাথে আর কী কী শর্তে ঋণচুক্তি হয়েছে সে সম্পর্কেও তাঁরা রাজ্যের মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখলেন। বাস্তবে বেসরকারীকরণ বিলগ্নীকরণ নিয়ে কংগ্রেস-বিজেপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাঁরা করেন, এ রাজ্যে নিজেরাই তা করছেন। অর্থাৎ বেসরকারীকরণ, ছাঁটাই, বাধ্যতামূলক অবসর, গোপন লেনদেন — সবই করেছেন। উদারীকরণের শুরুতে নরসীমা রাও সরকারের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে বিজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে সরকারি সংস্থাগুলি জলের দামে বেচে দেওয়া এবং এই লেনদেনের সময়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের যে অভিযোগ উঠেছিল, বামফ্রন্টের বিরুদ্ধেও কি সেই অভিযোগই উঠল না? তাছাড়া আইনসভাকে এড়িয়ে অর্ডিন্যান্স জারির মধ্য দিয়ে যেকোন জনবিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা এতদিন বুর্জোয়া দলগুলিরই একচেটিয়া ছিল; এখন দেখা যাচ্ছে, বামপন্থী নামধারী সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারও তাতে সমান দড়। মুখে বামপন্থীর মত কথা বলা এবং কাজে দক্ষিণপন্থীদের মত আচরণ করা সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির চরিত্র-লক্ষণ— যা চূড়ান্ত মার্কসবাদবিরোধী। এই লক্ষণই দিনের পর দিন সিপিএম সহ সরকারি বামপন্থী দলগুলির চরিত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে।

সিপিএম সরকার ৩৭০২ জন পরিবহণ কর্মীকে ছাঁটাই করতে চলেছে

সিপিএম সরকার রাজ্যের ৫টি পরিবহণ সংস্থায় ৩৭০২ জন কর্মচারীকে আগাম অবসর দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে সিএসটিসিতে ১৪০০, সিটিসিতে ৫০০, এনবিএসটিসিতে ১৬০০, এসবিএসটিসিতে ২০০ এবং ডব্লিউবিএসটিসিতে ২ জন কর্মী রয়েছেন। অন্যান্য বুর্জোয়া সরকারের মতই সিপিএম সরকারও কুযুক্তি তুলেছে, কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে পরিবহন সংস্থা চালানো সম্ভব নয়।

বেসরকারি বাসমালিকরা যখন বাসের পর বাস কিনছে তখন সরকারি পরিবহনে লোকসান কেন? এ প্রশ্নে না ঢুকে তাঁরা বলছেন, প্রতি বছর সিএসটিসিতে ৯২ কোটি ৮৯ লক্ষ, সিটিসিতে ৫৯ কোটি, এনবিএসটিসিতে ৪৪ কোটি, এসবিএসটিসিতে ২২ কোটি ৩০ লক্ষ অর্থাৎ মোট ২১৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। সরকার কোথায় পাবে এই টাকা? কিন্তু সিপিএম সরকারের অর্থাভাব কি শুধু শ্রমিক কৃষকের বেলায়? শিল্পপতিদের ভর্তুকি দিতে তার তো টাকার অভাব হয় না।

২০০১ সালে এক বছরেই রাজ্য সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের ৬ হাজার কোটি টাকা ছাড় দিয়েছে। ক্যাগ রিপোর্ট দেখিয়েছে, ২০০২ সালে রাজ্য সরকার শিল্পপতি গোয়েঙ্কাকে ২০৪ কোটি টাকা মকুব করে দিয়েছে। তাহলে পুঁজিপতিদের ভর্তুকির বেলায় সরকারের টাকার অভাব নেই। অভাব হচ্ছে শুধু শ্রমিক-কৃষকের বেলায়। প্রশ্ন হ'ল — তাহলে এই সরকার কাদের সরকার?

পরিবহণ সংস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং লোকসান আটকানো অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু সিপিএম সরকার ব্রিটিশ সংস্থা ডিএফআই ডি'র কাছে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। এই সংস্থারই ঋণশর্ত মেনে সরকার শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক ছাঁটাই করে চলেছে।

আই এম এ'র নির্বাচনে কারচুপি, জালিয়াতি, সন্ত্রাস

'গত ১৯ মার্চ আই এম এ-র (ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন) কলকাতা শাখার নির্বাচনে আই এম এ-র সর্বভারতীয় সভাপতি ডাঃ সুদীপ্ত রায়ের প্রত্যক্ষ মদতে স্বীয় প্রার্থী-প্যানেল জিতিয়ে নেওয়ার জন্য যেভাবে ঢালাও জালভোট দেওয়া হয়েছে, বিরোধী প্রার্থীদের উপর হামলা ও আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে এবং সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে নির্বাচন কার্যত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এ জিনিস আই এম এ-র ঐতিহ্যবিরোধী এবং নিন্দনীয়' — ২৪ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন বিরোধী প্যানেলের সম্পাদক পদে প্রার্থী ডাঃ কিষাণ প্রধান। ডাঃ প্রধান বলেন, রাজ্য সরকার এন আর আই কোটার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে অবৈধভাবে যে ছাত্র ভর্তি করেছিল, সুপ্রিমকোর্টের রায়ে যে ভর্তি বাতিল হয়, ডাঃ সুদীপ্ত রায় সেই ছাত্রদের পক্ষে দাঁড়িয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ ছাত্রদের ভর্তির বিরোধিতা করেছিলেন। ডাঃ প্রধান বলেন, এইভাবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ ছাত্রদের ভর্তির বিরোধিতা করা আই এম এ-র ঐতিহ্যবিরোধী। ডাঃ সুদীপ্ত রায় কার স্বার্থে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে মেধা-উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ন্যায়সঙ্গত ভর্তির বিরুদ্ধে এন আর আই ছাত্রদের পক্ষে দাঁড়ালেন ? তাঁর এই ভূমিকা আই এম এ-র সদস্য ডাক্তারদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

১৯ মার্চের আই এম এ কলকাতা শাখার নির্বাচনে যাঁরা বিরোধী প্যানেলে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা ক্যাপিটেশন ফি ও ডাঃ সুদীপ্ত রায়ের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং আই এম এ-র সুষ্ঠু কার্যপরিচালন পদ্ধতির দাবিতে লড়েছিলেন। তাঁদের এই বক্তব্য ডাক্তারদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতেই আশঙ্কিত হয়ে ডাঃ সুদীপ্ত রায় ভোটের শুরু থেকে তাঁর অনুগামীদের দিয়ে জাল ভোট দেওয়াতে থাকেন। এন আর এস মেডিক্যাল কলেজের কিছু ছাত্র-ইন্টার্ন যাঁরা আই এম এ-র সদস্য নন, ভোটারও নন, তাঁদের দিয়ে শুরু হয় ফল্‌স ভোট করানো। সময় এগোনোর সাথে সাথে ফল্‌স ভোটিং-এর মাত্রা ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। এমনকী ওঁদের প্রার্থী ডাঃ রাহুল দত্তও একাধিকবার ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ান। আই এম এ দমদম শাখার সদস্য ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী কলকাতা শাখার বর্ষীয়ান সদস্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তীর নামে জাল ভোট দিতে এলে বিরোধী ডাক্তাররা হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এছাড়া একজন চতুর্থবার ভোট দিতে এলে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুদীপ্ত রায় শিবির বিরোধী প্রার্থীদের উপর ও তাদের সমর্থকদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনে। কিল চড় ঘুঁষি এবং অশ্লীল গালিগালাজ সহ তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিরোধী প্রার্থী ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্তের উপর। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ওদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে আহত হন ডাঃ কিষাণ প্রধান, ডাঃ নাসরিন আলি, ডাঃ অংশুমান মিত্র সহ অন্যান্যরা। তাঁদের কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়, চেয়ার টেবিল উল্টে দেওয়া হয় এবং মারধোর করে বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়। সমস্ত ঘটনা ঘটে রিটার্নিং অফিসার ডাঃ নির্মাল্য চ্যাটার্জীর সামনে। এই অবস্থায় ভোট বয়কট করা ছাড়া বিরোধী প্যানেলের সামনে অন্য কোনও উপায় ছিল না বলে জানান ডাঃ কিষাণ প্রধান। ডাঃ প্রধান আই এম এ-র রাজ্য সম্পাদকের কাছে লিখিতভাবে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন।

এ হেন সম্পূর্ণ জালিয়াতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে অভিনন্দন জানান তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডাঃ সুদীপ্ত রায় মমতা ব্যানার্জীরই অনুগামী এবং তিনি বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন। তাঁরই প্রত্যক্ষ মদতে এ হেন কারচুপি, জালিয়াতি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে নির্বাচনকে মমতা ব্যানার্জী নিন্দা না করে উল্টে অভিনন্দন জানান। যে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সিপিএমের দুর্নীতি এবং নির্বাচনে কারচুপি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দিবারাত্র গলা ফাটাচ্ছেন, আজ তাঁরই অনুগামীরা আই এম এ-র নির্বাচনে একই কাজ করে প্রমাণ করে দিল, এ ব্যাপারে সি পি এমের সাথে তাদের কোনও পার্থক্য নেই।

অবশ্য তৃণমূলের এই রাজনীতি নতুন নয়। ১৯৯৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে ৯টি আসনে জেতার পর তৃণমূল নেত্রী রাইটার্স দখল করে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিরোধী সংগঠন ভেঙে এলাকা দখলের খেলায় মত্ত হন। বিজেপি-র সঙ্গে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে পুলিশ প্রশাসনের একাংশকে প্রভাবিত করে গুণ্ডা-মাফিয়াদের কাজে লাগিয়ে তৃণমূল-কংগ্রেসও মেদিনীপুরের কেশপুর-গড়বেতা সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংগঠন বিস্তারে নেমে পড়ে। কারণ আদর্শের জোরে মানুষকে প্রভাবিত করে সংগঠন করার মতো কোন আদর্শ তাদের নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য যেনতেনপ্রকারেণ সিপিএম-কে হটিয়ে ক্ষমতা দখল। কিন্তু মস্তান মাফিয়া লাগিয়ে সন্ত্রাসের রাস্তায় সংগঠন তৈরি ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে সিপিএমের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস এখনও নাবালক মাত্র। ফলে খুন-সন্ত্রাসের যে লাইন তৃণমূল নিয়েছিল, সেই লাইনেই সিপিএম তৃণমূলের সংগঠন ভেঙে দেয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতা দখলের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএমের মতই খুন সন্ত্রাসে হাত পাকাতে পিছপা হয় না। তৃণমূল কংগ্রেসের এহেন রাজনীতির দীক্ষায় দীক্ষিত ডাঃ সুদীপ্ত রায় আই এম এ-র নির্বাচনে তার স্বরূপই উন্মোচিত করলেন।

বিহারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের বিহার চ্যাপ্টারের উদ্যোগে পাটনায় গত ১৯ মার্চ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাক আক্রমণের প্রতিবাদে, ইরাকি জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত যুদ্ধবিরোধী জনগণের সামনে ফোরামের বিহার শাখার সভাপতি ডঃ এস এল মণ্ডল বলেন — ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া গভীরতর করেছে। ইউপিএ সরকারও সেই পথেই চলছে। তিনি বলেন — ইরাক থেকে মার্কিন-ব্রিটিশ ফৌজ প্রত্যাহার করার জন্য চাপ সৃষ্টিতে ভারত সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। অধ্যাপক ও পি জয়সওয়াল, অরুণ কুমার সিং প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ইরাকে মার্কিন তাণ্ডব

পাঁচের পাতার পর

সাতদিন বাদে আমি আবার আমেরিকানদের সাথে দেখা করলাম। তাদেরকে অনুরোধ করলাম আমাকে একটা গাড়িতে সাদা পতাকা লাগিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে অবশিষ্ট নাগরিকদের কাছের একটি মসজিদে জড়ো করার অনুমতি দেওয়া হোক। এক ঘণ্টার চেষ্টায় আমি এভাবে প্রায় ১০টি পরিবার, অর্থাৎ প্রায় ৫০ জন লোককে তাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে একটি মসজিদে জড়ো করতে পারি। দু'দিন বাদে ঐ মসজিদে জড়ো হওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০০। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানান যে, আমেরিকান সৈন্যরা ভালভাবে জেনেবুঝেই তাঁদের পরিবারকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। এমনকী এক্ষেত্রে তারা সাদা পতাকাকেও কোনও সম্মান জানায়নি। এই মসজিদেও আমরা একটি ছোট আউটডোর ক্লিনিক চালু করি।

শহরের কেন্দ্রীয় হাসপাতালটি এমনকী আজ পর্যন্ত মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। রোগীদের এখনও সেখানে পায়ে হেঁটে ঢুকতে হচ্ছে। কারণ যেকোনও গাড়ি সেদিকে এগোলেই নির্বিচারে গুলি চালান হচ্ছে।

এইরকম অবস্থাতেও এখনও অনেক মানুষ ফালুজা শহরে রয়ে গেছেন। কারণ তাঁদের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আবার অনেকে ফিরে এসেছেন। কারণ উদ্বাস্তুদের মতো তাঁবুতে জীবনযাপন তাঁদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে হয়েছে। এরকম মানুষও আছেন, যাঁদের পালাবার মতো যদি একটি গাড়িও জুটতো, তবে তাঁরা সানন্দে শহর ত্যাগ করতেন। কিন্তু আমেরিকানরা যে এইরকম হিংসাত্মক ব্যবহার করতে পারে, এটা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি। তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে মার্কিন সৈন্যরা নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকদের বা তাঁদের পরিবারকে লক্ষ্য করে এভাবে সরাসরি গুলি চালাতে পারে, বোমা ছুঁড়তে পারে। আমি বুঝি, সৈন্যদের কাজ যুদ্ধ করা, কিন্তু তাই বলে নিরস্ত্র মানুষ, শিশু-মহিলাদেরও তারা হত্যা করবে!

আমি মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে একটা বন্দোবস্ত করি যে, ঐ মসজিদের ২০০ জন মানুষের মধ্যে থেকে কয়েকজন স্বেচ্ছসেবীকে নিয়ে আমি রাস্তা থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের একটা চেষ্টা করব। কারণ পচাগলা মৃতদেহের গন্ধে টেঁকা দায় হয়ে উঠেছিল, এবং মহামারী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও উত্তরোত্তর বাড়ছিল।

তাই আজ ফালুজার মানুষ মার্কিনদের ঘৃণা করে। সামরিক বা অসামরিক সকল মার্কিনই তাদের ঘৃণার পাত্র। কারণ তারা দখলদার, খুনি এবং সন্ত্রাসবাদী। ফালুজার প্রায় প্রতিটি পরিবারই মার্কিনদের হাতে কাউকে না কাউকে হারিয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে মার্কিনদের প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কী প্রতিক্রিয়া আশা করা যেতে পারে?

প্রথম দৃষ্টিতে দেখে কথাটা এখনও অনেকেই বিশ্বাস করতে পারবেন না— শেষপর্যন্ত ফালুজাতে মার্কিন বাহিনীকে হারতেই হবে। কিন্তু সেটাই ঘটবে। কারণ, সমস্ত নীতিনৈতিকতা পরিত্যাগ করে যখন কোন শাসকশক্তি তার সমস্ত পাশব ক্ষমতাকে একত্রিত করে একটি ছোট্ট শহরকে ধ্বংস করতে এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার একটাই মানে হয়, তা হল — তার বিনাশ অনিবার্য। বিনাশের শুরুটা এমনভাবেই হয়।

(তথ্যসূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, www.iraktribunal.de)

অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে পরিচারিকা সমিতির বিক্ষোভ

কলকাতার ভবানীপুরের রমেশচন্দ্র মিত্র রোডের বাসিন্দা রাজকুমার অগ্রবালের বাড়ির কিশোরী পরিচারিকা সুনীতা শাহের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে ২ মার্চ। মাত্র ৬ মাস আগে ঐ বাড়িতে আবাসিক পরিচারিকা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল সুনীতা।

ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া রোডের ফল বিক্রেতা বীরবাহাদুর শাহের মেয়ে সুনীতা। মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়িতে ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে যায় হাসিখুশি প্রাণবন্ত যে মেয়েটি, পরের দিন তার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চালাবার চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু সুনীতার বাড়ির লোকেরা এবং প্রতিবেশীরা এই ঘটনাকে খুন করা হয়েছে বলে দৃঢ়ভাবে মনে করে। বীরবাহাদুর শাহ, রাজকুমার অগ্রবালের বড় ছেলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানান। প্রবল ক্ষোভে এলাকার মানুষ ফেটে পড়ে এবং অগ্রবাল পরিবারের সবাইকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। কিন্তু সেদিন পুলিশ অগ্রবাল পরিবারের কাউকে গ্রেপ্তার না করে উল্টে প্রতিবাদী দুই নিরপরাধ প্রতিবেশী যুবককে গ্রেপ্তার করে। পরে প্রবল বিক্ষোভের চাপে পড়ে পুলিশ রাজকুমার অগ্রবালের স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ এফ আই আর-এ অগ্রবাল পরিবারের বড় ছেলের নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং রাজকুমার ও তার বড় ছেলেকে গ্রেপ্তার না-করে তাদের আড়াল করতে চাইছে। ধনীর টাকার জোরে অসহায় পরিচারিকার মৃত্যু রহস্য চাপা দিয়ে আইন ও ন্যায়ের রক্ষকরা এবারও হয়তো অপরাধীদের আড়ালে রেখে দেবে। যেমন করে শ্যামপুকুরের পরিচারিকা টুম্পা মান্না (১৫), ভবানীপুরের সরস্বতী (১২), কালীঘাটের শিউলী (১১), সল্টলেকের লক্ষ্মী রাজবংশী (৪২) এবং এমন আরও অনেক অসহায় গরিব মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু রহস্য আজও চাপা পড়ে আছে।

সুনীতার মৃত্যুরহস্য উদঘাটন ও অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে ৮ মার্চ পরিচারিকারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ভবানীপুর থানায়। পরিচারিকা সমিতির নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান এবং এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

২১ মার্চ ভবানীপুর থানায় সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির আহ্বানে শত শত পরিচারিকা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বাকি অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

আন্দামান-নিকোবর

সুনামি-বিধ্বস্ত মানুষের পাশে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার ও ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি

মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার (এম এস সি) এবং ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সুনামিদুর্গত মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের ত্রাণকার্য পরিচালনা করা হয় গত ১১ থেকে ১৯ মার্চ। ডাক্তার, বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ৮ সদস্যের একটি দল লিট্‌ল আন্দামান, সাউথ আন্দামান এবং কার নিকোবরের ১৪টি স্থানে মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনা করে। ক্যাম্পগুলিতে প্রায় দেড় হাজার দুর্গত মানুষের চিকিৎসা করেন এম এস সি-র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। ব্রেকথ্রু-র পক্ষ থেকে সুনামি-বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণের কাজ চালানো হয়। দুর্গতদের মধ্যে ওষুধপত্র, খাবার প্লেট, খাতা ও কলম সহ বহু প্রয়োজনীয় জিনিস বন্টন করা হয়।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণকার্য চালাতে গিয়ে সেখানকার দুর্গত মানুষজনের দুরবস্থা এবং সরকারি অব্যবস্থা ও উদাসীনতার যে চিত্র স্বেচ্ছাসেবকরা দেখে এসেছেন, তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেল এম এস সি-র সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত এবং ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সহ সভাপতি ডঃ শুভাশিস মাইতির কথায়। তাঁরা জানিয়েছেন, সুনামির আক্রমণে গৃহহীন, সর্বস্বহারা বিপুল সংখ্যক মানুষ গত তিনমাস ধরে অস্থায়ী তাঁবুগুলির অপর্যাপ্ত স্থানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। শৌচালয়েরও যথেষ্ট অভাব আছে। দুর্গন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার দরুন এই মানুষগুলি সর্দি-কাশি, জ্বর, চর্মরোগ সহ বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এই অঞ্চলের সুনামিদুর্গত মানুষজন প্রবল অপুষ্টির শিকার ; মহিলা ও শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতার হার প্রচণ্ড।

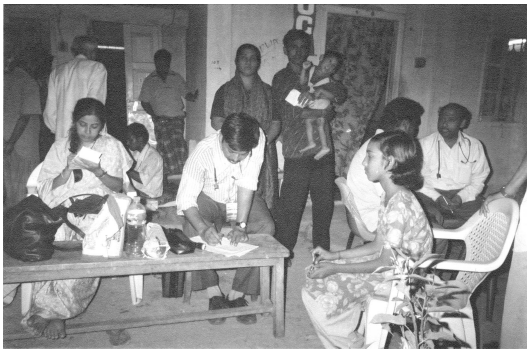

অথচ সরকারি তরফে দুর্গতদের জন্য স্থায়ী ঘরবাড়ি সহ সুপরিকল্পিত ত্রাণের কোনও বন্দোবস্ত করা হচ্ছে না। সাহায্য হিসাবে ৮২১ কোটি টাকা দেবার সরকারি ঘোষণা সত্ত্বেও সেই টাকার যথাযোগ্য ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্গত মানুষদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কাজের ব্যবস্থা করা দূরে থাক, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ — যেমন, মাছধরার জাল, নৌকা ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে না। যেটুকু কাজ দেওয়া হচ্ছে, তাতেও স্বজনপোষণ ও দলবাজির অভিযোগ উঠছে। ত্রাণবন্টনের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ। শুধু তাই নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য — ত্রাণের সরকারি টাকা দুর্গতদের জন্য খরচ করার পরিবর্তে সেই টাকায় সরকারি অফিসাররা নিজেদের অফিস সাজাতে এবং গাড়ির রঙ পাল্টাতে ব্যস্ত। এম এস সি এবং ব্রেকথ্রুর স্বেচ্ছাসেবকরাও ত্রাণকার্য পরিচালনায় সরকারপক্ষ থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা পাননি বলে জানা গেছে।

ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির বিজ্ঞানীরা তাঁদের পর্যালোচনায় জানিয়েছেন, সুনামি-বিধ্বস্ত এলাকাগুলির চাষের ক্ষেতে সমুদ্রের যে লোনা জল ঢুকে গিয়েছিল, তা এখনই বার করে দিলেও জমিগুলিতে আগামী ৩-৪ বছর চাষের কাজ করা যাবে না। তাঁরা আরও জানান, 'মেনল্যাণ্ড' থেকে গাছপালা নিয়ে এখানকার ছোট দ্বীপগুলিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে যেভাবে সেগুলি লাগানো হচ্ছে, তাতে পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

যে ১৪টি জায়গায় ৮ সদস্যের এই দলটি চিকিৎসাশিবির চালিয়েছেন, তার মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ারের নিউ পাহাড়গাঁও এলাকার শিবিরটি, সেই অঞ্চলের এস ইউ সি আই দলের কর্মী-সমর্থকদের সাহায্যে পরিচালনা করা হয়েছিল। শিবির পরিচালনার কাজে দলের স্থানীয় কর্মী কমরেড মহিউদ্দীন শেখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

'অ্যাবেকা'র নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষের পার্লামেন্ট অভিযান

রাজ্য সরকারগুলি যেভাবে দরিদ্র কৃষক ও সাধারণ গৃহস্থ গ্রাহকদের ব্যবহার্য বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি করে চলেছে এবং যেভাবে তারা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গত ২২ মার্চ পার্লামেন্ট অভিযানে সামিল হলেন পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা হাজার হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক। রামলীলা ময়দানে জমায়েত হয়ে বিশাল সুসজ্জিত ও দৃপ্ত এক মিছিল রঞ্জিৎ সিং মার্গ, মডার্ন স্কুল ফ্লাইওভার, টলস্টয় মার্গ এবং যন্তরমন্তরের রাস্তা ধরে পার্লামেন্ট অভিমুখে যায়। মিছিলে সামিল বিক্ষোভকারীরা সোচ্চারে দাবি তোলেন — অবিলম্বে বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ বাতিল করতে হবে ; ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা সহ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত বিদ্যুৎগ্রাহকদের প্রতি ইউনিট এক টাকা দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে ; গ্রামীণ এলাকা ও শহরের বস্তি এলাকার বৈদ্যুতিকরণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে নিতে হবে।

মিছিল পার্লামেন্ট স্ট্রিটে পৌঁছানোমাত্র পুলিশ বিক্ষোভকারীদের গতিরোধ করলে সেখানেই একটি বিক্ষোভসভার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন, দিল্লি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জাস্টিস রাজিন্দার সাচার, সাংসদ অবনী রায়, অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস, দিল্লি ও হরিয়ানার বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন যথাক্রমে 'ডেকা' ও 'হেকা'-র আহ্বায়ক রমেশ শর্মা ও সত্যবান এবং দিল্লির বিশিষ্ট জননেতা প্রতাপ সামল। সভাপতিত্ব করেন 'অ্যাবেকা'র সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলি। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সুরেন্দ্র মোহন, এই অভিযানের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করে যে বার্তা পাঠান, সভায় সেটি পাঠ করে শোনানো হয়। এছাড়াও মঞ্চে ছিলেন ডেকা-র প্রতাপ সামল ও জে এন মন্ডল এবং দিল্লি বিদ্যুৎ কর্মচারী সংগ্রাম সমিতির চেয়ারম্যান কে এল শর্মা।

বিচারপতি সাচার তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ চালু করে সরকার বিদ্যুতের বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে, অথচ বিদ্যুৎগ্রাহকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিতে এবং বিদ্যুতের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ চালু করার পিছনে সরকারের আসল উদ্দেশ্য হল, বিদ্যুৎকে একটি পণ্যে পরিণত করে তা থেকে পুঁজিপতিদের প্রভূত মুনাফা লুটে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। তিনি আরও বলেন, তথাকথিত 'পারস্পরিক ভর্তুকি' তুলে দেবার মাধ্যমে সরকারগুলি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ও বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে অত্যন্ত কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির যাবতীয় বোঝা দরিদ্র বিদ্যুৎগ্রাহকদের কাঁধে চাপাবার ব্যবস্থা করছে। তিনি বলেন, ''আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ চালু করা হলে কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলি ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হবে, গ্রামীণ ও বস্তি এলাকার বৈদ্যুতিকরণের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।''

ভাষণরত জাস্টিস রাজেন্দ্র সাচার। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) সত্যবান, সঞ্জিত বিশ্বাস, রমেশ শর্মা, ভবেশ গাঙ্গুলি, প্রতাপ সামল, কে এল শর্মা, জে এন মন্ডল

সাংসদ অবনী রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, তাঁরাও বিদ্যুৎ আইন-২০০৩-এর পরিবর্তনের পক্ষে এবং এজন্য বিভিন্ন বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

বিদ্যুৎগ্রাহকদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী পি এম সঈদের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। অ্যাবেকা, ডেকা ও হেকা-র পক্ষ থেকে যথাক্রমে সঞ্জিত বিশ্বাস, রমেশ শর্মা, জে এন মণ্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন। বিদ্যুৎমন্ত্রী তাঁদের জানান, রাজ্য সরকার চাইলে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নেবে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

নেতৃবৃন্দ বিদ্যুৎমন্ত্রীকে বলেন, বৃহৎ শিল্প, বহুজাতিক সংস্থা এবং লগ্নিকারীদের স্বার্থে পূর্বতন এন ডি এ সরকার যে বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ তৈরি করেছিল, বর্তমান ইউ পি এ সরকার তাকেই কার্যকর করছে। তাঁরা দাবি করেন, বিদ্যুৎ আইন-২০০৩-এর পর্যালোচনা নয়, এই আইনটিকে সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে।

ইরাকি জনগণের বিজয় অনিবার্য — বাসদ

ইরাক দখলের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইরাকের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সংহতি জানিয়ে ২০ মার্চ বিকেল সাড়ে ৪টায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের মুক্তাঙ্গনে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর উদ্যোগে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আবদুল্লাহ সরকার, ঢাকা মহানগর সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সাইফুর রহমান তপন। বাসদ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, নৃশংস গণহত্যা, বর্বরোচিত নির্যাতন কিংবা প্রহসনের নির্বাচন কোন কিছুই ইরাকি জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধকে দমাতে পারছে না। এটা আজকে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে ইরাকি জনগণের বিজয় অনিবার্য।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের জনগণ যখন তাদের ৩৪তম স্বাধীনতা দিবস পালন করতে যাচ্ছে তখনই ইরাক দখলের দু'বছর পূর্ণ হচ্ছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেআমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইরাকসহ বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষেরা আমাদের সমর্থন-সহযোগিতা যুগিয়েছিল। আজকে ইরাকিরা মুক্তিযুদ্ধ করছে। আমাদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু আমাদের শাসকশ্রেণী তাদের সাম্রাজ্যবাদ তোষণনীতির কারণে সে ভূমিকা রাখছে না। তাই বাংলাদেশের জনগণকে ইরাকিদের সমর্থন-সহযোগিতা যোগানোর পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in